শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

LIBRARY 3/285
... Ashram
BANARAS.

তৃতীয়ভাগ।

লীলা-কথা

[উত্তরার্দ্ধ]

(প্রথম অংশ)

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

LIBRARY
No. 9/138 3/285
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

তৃতীয়ভাগ।

লীলা-কথা

[উত্তরার্দ্ধ]

(প্রথম অংশ)

বেনারস গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ,

প্রণীত

প্রকাশক :—

শ্রীদুর্গাকান্ত রায়, বি, এ, বি, এল,

পেন্সন প্রাপ্ত সব-জজ ;

'বিশুদ্ধানন্দ-কানন'—বেনারস ক্যাণ্ট পোষ্ট আফিস,

৺কাশীধাম।

শিবচতুর্দ্দশী, ৩ ফাল্গুণ সন ১৩৩৭ সাল।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়,—
বিশুদ্ধাশ্রম—বর্দ্ধমান।

২। শ্রীগণপতিলাল ঝা, এম, এ,—
বিশুদ্ধানন্দ-কানন—বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

৩। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ,—
১৫।১, এলগিন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৪। রায়-সাহেব শ্রীননীলাল মুখোপাধ্যায়,—
১, লভলক্ ষ্ট্রীট্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু,—
৭, কুণ্ডুরোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৬। শ্রীসত্যগোপাল দত্ত,—
২, আনন্দ চাটার্জ্জি লেন, অমৃতবাজার-পত্রিকা-আফিস,
বাগবাজার, কলিকাতা।

৭। শ্রীকেদারনাথ ভৌমিক,—
১৩২।১. আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৮। শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—
৬, নীলাম্বর মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

কাপিরাইট—শ্রীশ্রীমদ্‌বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব
বিশুদ্ধানন্দ কানন—বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

৺কাশীধাম, কমলা প্রেস হইতে
শ্রীভূপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1
No 3/285
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়,—
বিশুদ্ধাশ্রম—বর্দ্ধমান।

২। শ্রীগণপতিলাল ঝা, এম, এ,—
বিশুদ্ধানন্দ-কানন—বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

৩। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ,—
১৫।১, এলগিন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৪। রায়-সাহেব শ্রীননীলাল মুখোপাধ্যায়,—
১, লভলক্ ষ্ট্রীট্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু,—
৭, কুণ্ডুরোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৬। শ্রীসত্যগোপাল দত্ত,—
২, আনন্দ চাটার্জ্জি লেন, অমৃতবাজার-পত্রিকা-আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

৭। শ্রীকেদারনাথ ভৌমিক,—
১৩২।১, আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৮। শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—
৬, নীলাম্বর মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

কাপিরাইট—শ্রীশ্রীমদ্‌বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব
বিশুদ্ধানন্দ কানন—বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

৺কাশীধাম, কমলা প্রেস হইতে
শ্রীভূপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

Bangiya Academy
3|285

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ	শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চন্দ্র
৫৭	১-২	ঐ	ঐ
·৩	২	মাত্র মাত্র	মাত্র
২০	১৭	কুড়াল জোড়	জুড়ানপুর
৬১	২০	পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত
৭১	৪	অত্যন্ত	অতান্ত
৭৪	১	গেলেন	গেলেন।
৭৬	১১	তক্তপোষ	তক্তাপোষ
৭৯	১	সময়	সময়ে
৭৯	৪	মুখার্জ্জী	মুস্তফী
৭৯	২০	শরন	শয়ন
৮০	১৯	সন্তান	সন্তান
৮১	৩	বাস্তাবকই	বাস্তবিকই
১২২	৫	বাড়া	বাড়ী
১৬০	১৮	পাঞ্জাবী গলায়,	পাঞ্জাবী, গলায়

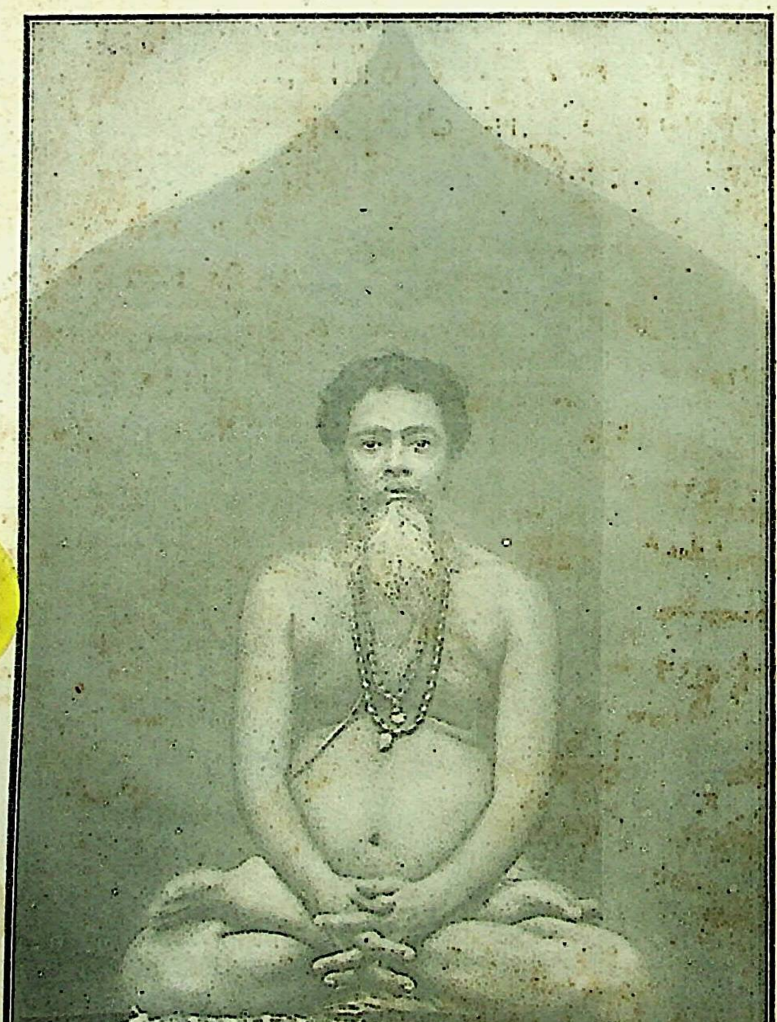

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেব।

৭।১৭৫ 3/285
Ashram

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ

লীলা-কথা

(উত্তরার্দ্ধ)

—— ঃ*ঃ ——

শ্রীচন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এল, এম, এস
পোঃ অযোধ্যা, জেলা বাঁকুড়া।

সন ১৩১৬ সাল ১৭ই তারিখে আমার দীক্ষার দিন স্থির হয়। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (পুলীস সাহেব) আমাকে তাঁহার কুঠিতে গিয়া দীক্ষা লইতে বলিলেন, কিন্তু আমার তাহা মনঃপূত হয় নাই। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার বাসায় এক দিবস সশিষ্য অবস্থান করেন। যথা সময়ে তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন—তখন তাঁহার সহিত বিদেশী শিষ্য সংখ্যায় প্রায় ২০।২৪ জন ছিলেন। আমি সকলকেই ঐ তারিখে আমার বাটীতে আহ্বান করি। বাবাজীর ইচ্ছা অনুযায়ী 'ভুনি খেঁচুড়ী' তৈয়ারি করা হয়। মৎস্য তখন সেবায় দেওয়া চলিত, সুতরাং মৎস্যের কালিয়া ও অন্যান্য তরকারী ও করা হয়। বাবাজীর আহার শেষ হইবার পর শিষ্যদের জন্য যখন পাতা করা হয়, সেই সময় পুরুলিয়া হইতে হঠাৎ ২০।২৫ জন শিষ্য ডাউন গোমো প্যাসেঞ্জারে আসিয়া উপস্থিত হন।

আমি তাঁহাদিগকে ঐরূপ অসময়ে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হই, কারণ মোটে ৩০।৩২ জনের উপযুক্ত আহার্য্য প্রস্তুত করান হইয়াছিল, এ সময়ে ঐ সকল আহার্য্য পুনরায় প্রস্তুত করা দুঃসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ। আমার মানসিক অবস্থা দেখিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার নিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "বাবা, চিন্তা কি? সকলের পাতা করিয়া দাও। রান্না ঘরে তুমি ও বধূমাতা ভিন্ন অন্য কেহ যেন প্রবেশ না করে। খিচূড়ীর হাণ্ডার মুখ সর্ব্বদা ঢাকা রাখিবে, বধূমাতা অন্ন বাহির করিয়া গামলায় দিবেন, তুমি উহা ঘর হইতে বাহিরে আনিয়া পরিবেশনকারিগণকে দিবে।" তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিয়া দেখা গেল যে একবার হাণ্ডা হইতে অন্ন বাহির করিয়া পরিবেশনকারীদের হস্তে দেওয়ার পর পুনরায় যখন অন্ন বাহির করিবার জন্য ঢাকনা খোলা হইল, তখনও হাণ্ডা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রায় ৪০।৪৫ জন শিষ্য পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করার পরও হাণ্ডা রিক্ত হইল না। বাবাকে ঐ ব্যাপার সংবাদ দেওয়ায় তিনি বলিলেন যে তুমি ও বধূমাতা যতক্ষণ আহার না করিবে ততক্ষণ ঐ হাণ্ডা পূর্ণই থাকিবে।

সন ১৩১৬ সালের পৌষ মাসে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব ভেলিবড়া গ্রামে পুনরায় শুভাগমন করেন এবং তথায় মাসাবধি থাকিয়া মাঘ মাসে বাঁকুড়ায় আসেন ও আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ অপূর্ব্বকুমার বাবাজীকে দীক্ষা দেন। ঐ ঘটনার এক

LIBRARY 3/285

মাস পরে গুরুদেব গুষ্করা হইতে একখানি পত্রে আদেশ দেন —'তুমি পত্রপাঠ মাত্র মাত্র শ্রীমান্ অপূর্ব্বকে সঙ্গে লইয়া গুষ্করায় আসিবে'। তাঁহার আজ্ঞামত তৎপর দিন রওয়ানা হইয়া, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করি। আহারাদির পর শ্রীশ্রীগুরু-দেব একটি তক্তার উপর বসিয়াছিলেন এবং শ্রীমান্ অপূর্ব্বকুমার পদসেবায় নিরত ছিল। আমি নীচে বসিয়া বাঁকুড়ার অন্যান্য শিষ্যগণের কুশল সমাচার জ্ঞাপন করিতেছিলাম। হঠাৎ বাবাজী অপূর্ব্বকে বলিলেন—'নেহাৎ ভাঁড় নইরে বাপু'। তাঁহার এই আকস্মিক উক্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি তাকাইয়া দেখি যে শ্রীমান্ অপূর্ব্বকুমারের ডান হাতের চারিটি অঙ্গুলি বাবার বাম পায়ের ডিমের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে ও সে টানিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। বাবা আমাকে বলিলেন যে তোমার ভাগিনেয়ের মনে সন্দেহ হয় যে আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া একজন ঐন্দ্রজালিকের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তিনি অঙ্গুলি মুক্ত করিয়া দিয়া অপূর্ব্বকে বলিলেন, —"দীক্ষার পর গুরুকে সন্দেহ করা নিতান্ত অন্যায়, তাহাতে নিরয়গামী হইতে হয়। প্রথমে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া পরে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু একবার দীক্ষা গ্রহণের পর আর বিন্দুমাত্রও দ্বিধার ভাব মনে না রাখিয়া গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে তৎপর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এখনও যদি তোমার মনে সন্দেহ থাকে জানাও, তুমি যে কোনও যোগ বিভূতি দেখিতে ইচ্ছা করিবে আমি

তাহাই তোমাকে দেখাইতে প্রস্তুত।" তখন তাহার প্রার্থনামত তিনি তাহাকে নাভিধৌতির ক্রিয়া দেখান। নাভিদ্বার প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ প্রসারিত করেন ও একটি বড় স্ফটিক লইয়া ঐ দ্বার দিয়া প্রবেশ করাইয়া মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেন। তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতায় ভীত হইয়া অপূর্ব্ব তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা ভিক্ষা করে।

সন ১৩১৭ সালে ফাল্গুন মাসে ৺শিবরাত্রি ব্রত উপলক্ষে ৪।৫ দিন পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য আমরা বাঁকুড়া হইতে পাতা ও তরকারী একটা গো-যানে করিয়া হাঁটা রাস্তা দিয়া বণ্ডুলে পাঠাই এবং আমরা নিজে একদিন পূর্ব্বে ট্রেণে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যার সময় আশ্রমে পৌছাই। আমরা গিয়া শুনিলাম আমাদের প্রেরিত গো-যান তখন পর্য্যন্তও আসিয়া পোঁছে নাই। চিন্তায় আমাদের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, কারণ বণ্ডুল বা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে পাতা পাওয়া যায় না। শিবরাত্রির দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন গো-যানের কোনই সংবাদ মিলিল না, তখন আমরা হতাশ হইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"রাস্তায় তোমাদের গাড়ীর ব্যাঘাত হইয়াছে। কল্য প্রাতে কুমারী ভোজন বা ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বে ঐ গাড়ী আসিতে পারিবে না।" আমরা তাঁহার পদযুগল ধরিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাতরে প্রার্থনা করায় তিনি আশ্বাস দিয়া বলেন—"চিন্তা কি বাবা? ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছায় তোমাদের কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন

হইবে—তোমাদের সাধু সঙ্কল্প কখনই ব্যর্থ হইবে না। জগদম্বার কৃপায় কি না হয়?" আমরা পরদিন অতি প্রত্যূষে আশ্রমের চৌকীদার যদুকে পাতার গাড়ীর সন্ধানে বর্দ্ধমানের রাস্তায় পাঠাই। সে বেলা ৮টার সময় ফেরৎ আসিয়া সংবাদ দিল যে কুড়্মন পর্য্যন্ত গিয়াও সে গাড়ীর কোনও সন্ধান পায় নাই, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় ভাঁড়ারডিহির রাস্তায় একগাড়ী কলাপাতা আশ্রম অভিমুখে আসিতে দেখিয়াছে এবং চালককে জিজ্ঞাসা করায় জানিয়া আসিয়াছে যে বগুল আশ্রমই ঐ গাড়ীর গন্তব্য স্থান। কিছুক্ষণ পরেই ঐ কলাপাতার গাড়ী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে কায়গ্রামের এক জন কায়স্থ ভদ্রলোক ঐ পাতা পাঠাইয়াছেন। ঘণ্টাখানেক পর ঐ পাতার প্রেরক স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তিনি আমাদের সকলেরই অপরিচিত। তাঁহাকে হঠাৎ এই পাতা পাঠাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন—"গত বৈকাল বেলায় আমি আমার একটি পাঁচবৎসর বয়সের ছেলের সঙ্গে একটি নূতন পুকুরের পাড়ে বেড়াইবার সময় হঠাৎ সেই ছেলেটি বলিয়া উঠে,—'বাবা, বগুল আশ্রমে পাতার অভাবে আগামী কল্য কুমারী ভোজন ও ব্রাহ্মণ ভোজন পণ্ড হইতে বসিয়াছে। তোমার ত এত কলাগাছ আছে, এক গাড়ী পাতা আশ্রমে পাঠাইয়া দাও না।' তাহার এই কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কারণ বগুল আশ্রমে কুমারী ভোজন ও ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা লোকপরম্পরায় শুনিবার

সম্ভাবনা থাকিলেও ঐ ছোট ছেলেটির সে সম্বন্ধে কোনও সংবাদ জানার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং উঁহাকে দৈব-প্রত্যাদেশ ভাবিয়া আমি ঐ রাত্রেই এক গাড়ী কলাপাতা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করি।” বাবাজী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আমাদের বলিলেন—“বাবা, সকলই ব্রহ্মময়ীর খেলা, তাঁহার কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন। আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। নির্ভরশীল হও, তখন বুঝিবে যে অভাব কিছু থাকিতে পারে না।”

পৌষ মাসে এক দিবস পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব বর্দ্ধমান রাজার প্রতিষ্ঠিত ১০৮ শিবালয় ও ৺দুর্ল্লভা দেবীকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাঁহার কথামত এক রবিবারে বেলা একটার সময় দুইখানা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ৮।১০ জন তাঁহার সঙ্গে যায়। শিবালয়ে যাইয়া দর্শন করিবার পর উহারই হাতার মধ্যস্থলে একটি ছোট পুকুরের বাঁধান ঘাটে সকলে বসিয়া গল্প করিতে থাকেন। এমন সময়ে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব তামাক খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেস্থানে কেবল একজন দারোয়ান ভিন্ন অপর কোন লোকের বসতি ছিল না। আমরা দারোয়ানের নিকট গিয়া তামাকের সাজ সরঞ্জাম আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে কেবল মাত্র একটি কলিকা দিয়া জানাইল যে সে তামাক খায় না, শুধু গাঁজা খায়। কলিকা লইয়া বাবাকে তামাকের অভাবের কথা জানাইতেই তিনি বলিলেন তামাকের জন্য চিন্তা নাই, এখনই আনিতেছি।’ এই বলিয়া হস্ত মুঠা করেন ও পরক্ষণেই খুলিয়া দেখান যে সেই

মুঠার মধ্যে কাল রঙ্গের তরল পদার্থ মাখা রহিয়াছে। আমরা আঘ্রাণ লইয়া দেখিলাম যে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বিষ্ণুপুরের তামাকের গন্ধ বাহির হইতেছে। পুনরায় হস্ত মুঠা করিয়া একটু পরে তাহা হইতে এক কলিকা আন্দাজ তামাক বাহির করিলেন। আমরা পাতা ও শুক্‌নো ডাল পোড়াইয়া আগুন করিয়া ঐ তামাক তাঁহাকে দিই। তিনি তামাক সেবন করিয়া উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমরা বলিলাম—"বাবা, আপনার সহিত ঠাকুর দর্শন করিলাম, কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ ত আমাদের ভাগ্যে মিলিল না। অতএব আমাদিগকে কিছু প্রসাদ দিন।" ঐ কথা বলাতে তিনি হস্ত মুঠা করিলেন, ও হাত পাতিলে প্রত্যেক শিষ্যকে ৺বৈদ্যনাথে যে প্রকার পেঁড়া পাওয়া যায় সেই প্রকার একটি করিয়া টাট্‌কা ও অত্যন্ত সুস্বাদু পেঁড়া দিলেন। আমাদের মধ্যে একজন গৌরাঙ্গ ভক্ত অত্যন্ত গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাকে প্রসাদ লইতে বলায় তিনি বাবাকে জানাইলেন যে তিনি শিবের প্রসাদ খাইবেন না, উহা তাঁহাদের অস্পৃশ্য! বাবা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন—"দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদের অবমাননা করার অপরাধে তোমাকে বিশেষ প্রতিফল পাইতে হইবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ রাত্রেই ঐ ভদ্রলোক প্রবল শূলরোগে আক্রান্ত হয়েন। সমস্ত রাত্রির মধ্যে কোনও প্রকার চিকিৎসায় বেদনা নিবৃত্ত না হওয়াতে প্রাতে আসিয়া বাবাজীর শরণাপন্ন হয়েন ও অনেক কাকুতি-মিনতির পর ৺শিবের স্নান জল খাইয়া আরোগ্য

লাভ করেন। ঐ তারিখে প্রাতঃকালে বর্দ্ধমানের অন্যান্য শিষ্যগণ আসিয়া সমবেত হইলে গতদিনের শিব দর্শন ও প্রসাদ বিতরণের কথা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট ৺শিবের প্রসাদ বিতরণের জন্য অনুযোগ করেন। তিনি তাঁহাদের একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমাকে আদেশ দেন,—"পূজার ঘরে গিয়া থালাতে যে পেঁড়া আছে তাহা লইয়া আইস।" ঐ থালা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নিত্যকার মত ধুইয়া রাখা হইয়াছিল। ঐ ঘরে কখনও কোনও খাদ্য দ্রব্য রক্ষিত হইত না, ইহা আমরা জানিতাম। কিন্তু তাঁহার কথা মত যাইয়া দেখি, ঐ থালা পেঁড়াতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; এবং পেঁড়াগুলি অতি টাট্‌কা। প্রসাদ বিতরিত হইল।

মাঘ মাস, ১৩১৮ সাল। একদিন প্রাতে বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জস্থ নেপাল বাবুর বাসার বাবাজীর অবস্থানের সময় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র নাথ ঘোষ (মুনসেফ), রজনীকান্ত কোঙর প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দ উপস্থিত হয়েন ও পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবকে কিছু যোগবিভূতি দেখাইতে অনুরোধ করেন। তিনি দয়া করিয়া বলেন,—"তোমরা একখানা কাগজে যে কোনও একটি সংস্কৃত শ্লোক আমার অসাক্ষাতে লিখিয়া আন ও তাহা মুড়িয়া আনিয়া আমার কলিকার আগুনে পুড়াইয়া দাও। আমি ঐ শ্লোকটি তোমাদের নিকট আনিয়া দিব।" তাঁহারা বাহিরে আসিয়া একখানা কাগজে—"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ” এই শ্লোকটি লিখিয়া ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া আনিয়া বাবাজীর কলিকার আগুনে ফেলিয়া দিলেন। কাগজ সম্পূর্ণ পুড়িয়া যাওয়ার পর গুরুদেব উঠিয়া গিয়া আহ্নিকের ঘরে কিছুক্ষণ থাকিয়া বাহির হইয়া আসিয়া আমাদিগকে একখণ্ড কাগজ দিলেন। ঐ কাগজে উপরি উক্ত শ্লোকটি লেখা ছিল। দেখা গেল “জানামি অধর্ম্মং” এই দুই পদ লাল কালী দ্বারা কাটা রহিয়াছে, ও তাহার পরিবর্ত্তে “জানাম্য-ধর্ম্মং” লেখা রহিয়াছে। কাটার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গুরুদেব বলিলেন—“তোমরা ভুল লিখিয়াছিলে। নায়িকাগণ তোমাদের ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।” আমরা অনুযোগ করিলাম যে ঐ কাগজটি ঠিক আমাদের লেখা কাগজ নহে এবং লেখাও বিনোদ দাদার হস্তাক্ষর নহে (বিনোদ দাদাই কলিকার অগ্নিতে দগ্ধ কাগজ খানিতে লিখিয়াছিলেন) এবং ভুলও আমরা করি নাই। তাহাতে তিনি বলিলেন,—“কাগজ ও লেখা পৃথক্ বটে তবে ভুল তোমরাই করিয়াছ।” আমরা অস্বীকার করায় তিনি বলেন,—“যদি তোমরা ১০৮টি কুমারী ভোজন করাইতে স্বীকৃত হও, তবে তোমাদের লেখা কাগজ, যাহা পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া দিতে পারি।” আমরা স্বীকৃত হওয়ায় তিনি উঠিয়া যান ও কিছু ক্ষণ ক্রিয়ার ঘরে কাটাইয়া ফিরিয়া অবিকল সেই কাগজখানি আমাদিগকে দেন ও দেখান যে ভুল আমরাই করিয়াছিলাম। আমরা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বৈকালে পাঁচটার সময়ে

একটি ৫৫।৫৬ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ ভদ্রলোক শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য আসেন। তিনি বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র আমাকে বলেন,—"নীরদের দাদা আসিয়াছেন, তাঁহাকে জল খাবার দাও।" ৺নীরদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাবাজীর একজন পুরাতন শিষ্য ছিলেন এবং তখন বর্দ্ধমানের সদর পুলিশ ইন্সপেক্টার ছিলেন। আমরা তাঁহাকে জলযোগ করিতে আহ্বান করিলে তিনি বলেন যে একটু পরে খাইবেন। যথা সময়ে গুরুদেব সন্ধ্যা করিতে উঠিলে পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাটীর ভিতর চলিয়া আসেন ও বাবাজীর নিকট তৎপর দিন দীক্ষিত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব তদুত্তরে বলিলেন,—"এই সবেমাত্র তোমার সঙ্গে আলাপ হইল। এখন পর্য্যন্ত তুমি আমাকে কিছুমাত্রও জাননা। দীক্ষা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। উভয় পক্ষের দায়িত্ব খুব বেশী। অতএব ভাল করিয়া না জানিয়া শুনিয়া কাহারও নিকট আত্ম-সমর্পণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তুমি বহুদিবস হইতে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বহু তীর্থস্থানে ঘুরিয়াছ ও আজ পর্য্যন্ত অনেক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছ, কিন্তু কাহাকেও পছন্দ কর নাই। হঠাৎ খেয়ালের বশে এক মুহূর্ত্তের আলাপে দীক্ষা প্রার্থনা করা উচিত নহে।" ঐ কথা শুনিবার পরও তিনি নিরস্ত না হইয়া আরও অনুনয় বিনয় করিতে থাকেন। তাহাতে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব "পরে দীক্ষা হইবে" এই কথা বলিয়া সন্ধ্যা করিতে চলিয়া যান। অল্পক্ষণ পরেই ৺নীরদ দাদা

আসিয়া উপস্থিত হন। বাবাজী ক্রিয়া করিয়া উঠিবার পর তাঁহারা দুই জনে মিলিয়া আবার অনুনয় বিনয় করেন। বাবা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহারা দুইজনে রাত্রি ৯টার পর বাসায় যান। আন্দাজ ভোর চারিটার সময় আশ্রমের সদর দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমরা উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখি যে নীরদ বাবুর দাদা দাঁড়াইয়া আছেন ও হাঁপাইতেছেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"বাবা কোথায় আছেন ও কি করিতেছেন?" প্রত্যুত্তরে আমরা জানাইলাম যে তিনি ক্রিয়ায় বসিয়াছেন ও প্রাতে ৬টার পূর্ব্বে বাহির হইবেন না। কিন্তু তিনি ঐ কথা বিশ্বাস করিলেন না, ও প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার বাসায় গিয়াছিলেন ও তাঁহাকে সেই দিনই দীক্ষা দেওয়া হইবে এই আদেশ জ্ঞাপন করিয়া আশ্রমে আসিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। নীরদ বাবুর দাদামহাশয় বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে শুইয়াছিলেন। তিনি বাবাকে একখানা বেঞ্চের উপর গায়ের চাদর পাতিয়া বসিতে দেখিয়া নীরদ বাবুকে বাবার আগমনের সংবাদ দিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে যান ও তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকেন। নীরদ বাবুর স্ত্রী ঐ ডাক শুনিয়া উঠিয়া খোলা জানালা হইতে বারান্দায় পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পান ও তাড়াতাড়ি খিল খুলিয়া বাহির হইয়া আসেন। কিন্তু

বাহিরে আসিয়া আর কিছু দেখিতে পান না। নীরদ বাবুর দাদাও বাহিরে আসিয়া বাবাকে না দেখিতে পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আশ্রমে আসেন। আশ্রম তাঁহার বাসা হইতে আধ মাইলের কিছু বেশী হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব রাত্রি ১২।১ টার সময় ক্রিয়ায় বসেন ও বেলা ছয়টার পূর্ব্বে ক্রিয়া-স্থান হইতে বাহির হন না। সুতরাং তাঁহার স্থূল শরীরে রাত্রি চারিটার সময় নীরদ বাবুর বাসায় যাওয়া অসম্ভব। ঐ তারিখে দুইজন মহিলার দীক্ষার দিন নির্দ্ধারিত ছিল। দীক্ষার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সে সব উপকরণও সংগৃহীত ছিল। মহিলা দুইটি প্রত্যূষে স্নান সারিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। নীরদবাবুর দাদাও স্নান সমাপন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব ছয়টার সময় ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই নীরদ বাবুর দাদাকে দীক্ষা দেন।

গুস্করার নিকটস্থ কোন্ গ্রাম নিবাসী একজন ভদ্রলোক কলিকাতায় ব্যবসায় করিতেন। তিনি কলিকাতা হইতে নিজের নৌকাতে মাল লইয়া গিয়া ডায়মণ্ড হারবারে জাহাজে বোঝাই দিতেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা ভিন্ন অপর কেহ ছিল না। কলিকাতার জনৈক খ্যাতনামা জ্যোতিষী তাঁহার ও তাঁহার কন্যার কোষ্ঠী দেখিয়া বলেন যে তাঁহার ঐ কন্যার ফল ভাল নহে,—তাঁহার বংশ থাকিবে না ও তাঁহার নিজেরও এক বৎসরের মধ্যে প্রবল মৃত্যুযোগ আছে। তিনি ঐ গণনায় অতিশয় বিচলিত

হইয়া বাবাজীর শরণাপন্ন হন। বাবাজী তাঁহাকে বলেন যে জ্যোতিষী গণনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই বলিয়াছেন। পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার উপর ব্রহ্মশাপ হইয়াছিল তাহার, ফলে এ জন্মে নির্ব্বংশ যোগ ঘটিয়াছে ও তাঁহার নিজেরও জলে ডুবিয়া মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে। ভদ্রলোক ঐ বিপদের প্রতিকারের নিমিত্ত বাবাজীর নিকট কাঁদাকাটা করেন, কিন্তু বাবা তাঁহাকে কোন প্রকার ভরসা দিতে স্বীকৃত হন নাই। ভদ্রলোকটি অতিশয় কাকুতি-মিনতি করাতে তাঁহাকে শুধু জানাইলেন যে পশ্চিম হইতে তাঁহার গুরুদেবের আদেশ না পাইলে কোন প্রকার প্রতিকার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। তিনি অনুমতির জন্য পত্র দিতে স্বীকার করেন এবং ঐ পত্রের মর্ম্মার্থ যাহা হইবে ঐ ভদ্রলোকটিকে তাহা যথা সময়ে জানাইবেন বলেন। কিছুদিন পরে বাবার পত্রের উত্তর আসে যে ঐ ব্রাহ্মণের প্রাক্তন কর্ম্মের ফলাফল যাহা ঘটিবে তাহার উপর যেন কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না করা হয়। ঐ সংবাদ ভদ্রলোকটিকে জানান হয়। তিনি আবার নিজে আসিয়া বাবার পায়ে ধরিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি অনুনয় বিনয় করেন ও অভুক্ত অবস্থায় আশ্রমে পড়িয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকায় বাবার সেবার ব্যাঘাত হয়। তিনি সন্ধ্যার পর ক্রিয়া হইতে উঠিয়া তাঁহাকে জানান যে তাঁহার নিজের প্রাণ তিনি রক্ষা করিবেন, তবে তাঁহার কন্যার সম্বন্ধে তিনি কিছু করিতে পারিবেন না। কারণ গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

ঐ ব্রাহ্মণ কতক পরিমাণে শান্ত হইয়া ফিরিয়া যান। তিনমাস পরে তিনি সংবাদ দেন যে হঠাৎ সর্পাঘাতে তাঁহার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার ৪।৫ মাস পরে একদিন অপরাহ্নে ৩টা বা ৩॥ টার সময় বাবা তাঁহার নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাকে ডাকেন। আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়া গিয়াছে এবং কর্দ্দমাক্ত জলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানিও মলিন হইয়া গিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"এই ভদ্রলোকের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া আমার এই অবস্থা হইয়াছে। ডায়মণ্ড হারবারের পথে নৌকা জলমগ্ন হইয়া তিনি ডুবিয়া যান। আমি তাঁহাকে তুলিয়া নিকটস্থ চড়ায় রাখিয়া আসিয়াছি।" কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া বর্দ্ধমান আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন তাঁহার প্রমুখাৎ আমরা সকল ঘটনা অবগত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই।

একজন প্রিয় শিষ্য পুলিশের দারোগার কর্ম্ম করিতেন। মানভুমের বাঘমুণ্ডি থানায় একবার তাঁহার বদলি হয়। সেখানে কার্য্যে যোগদানের কিছুদিন পরে নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে সংবাদ আসে যে একটি কুরমী খুন হইয়াছে এবং তাহার মৃত দেহ মাঠে পড়িয়া আছে। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়। দারোগা বাবু তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যাইবার জন্য উদ্যোগ করাতে তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারী তাঁহাকে জানান যে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী পাহাড় ও জঙ্গলে বাঘের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সে জন্য রাত্রে কোথাও তদন্তে যাওয়ার ব্যবস্থা সে থানায় কখনও হয় না,

৭|১০৬৪ 3/285

বরাবরই আবশ্যক হইলে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। সহকারী কর্ম্মচারীটির কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া দারোগা বাবু তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন ও ২।৩ জন কনেষ্টবল ও ৪।৫ জন তাঁবেদার লইয়া রওয়ানা হইয়া যান। কিছুদূর যাইলে পর তিনি একটি ছোট পাহাড় দেখিতে পান। পাহাড়ের উপর তাঁহারা পঁহুছিলে হঠাৎ একটি বড় বাঘ তাঁহাদের রাস্তার সম্মুখে ৮।১০ হাত দূরে আসিয়া বসে। তাহার ভীষণ আকৃতি ও ভাব ভঙ্গী দেখিয়া দারোগাবাবু সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। তাঁবেদার ও কনেষ্টবলগণ চীৎকার করায় বাঘ পলাইয়া যায়। পরে তিনি চৈতন্যলাভ করিয়া গন্তব্য স্থানে যান ও তদন্ত শেষ করিয়া থানায় ফিরিয়া আসেন। দুই তিন দিন পরে তিনি শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে একটি পত্র পান, তাহাতে লিখিত ছিল,—"ইচ্ছা করিয়া বিপদের সম্মুখীন হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। স্থানীয় লোকদের নিষেধ সত্ত্বেও তুমি 'জয় গুরু' বলিয়া থানা হইতে বাহির হওয়ার ফলে আমাকে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বাঘ তাড়াইয়া বেড়াইতে হইয়াছে। ইহাতে আমার ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইয়াছে। যে সকল বিপদ দৈবাধীন তাহার জন্য সাহায্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু ইচ্ছাধীন বিপদের জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করা তোমাদের কর্ত্তব্য নহে।"

বাবাজীর জনৈক শিষ্য চিরকুণ্ডা থানায় দারোগার কার্য্য করিতেন। তিনি একদিন প্রাতঃকালে ক্রিয়া করিবার জন্য

প্রস্তুত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হয়েন। সম্মুখে একটি ছোট চৌকীতে বাবার এক জোড়া খড়ম ও একখানি ফোটো বাঁধান ছিল! আহ্নিক করিতে আরম্ভ করিয়া তিনি নিকটস্থ কোন প্রতিবেশী স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন। হঠাৎ তিনি পৃষ্ঠে একটি দারুণ আঘাত অনুভব করেন ও কাচ ভাঙ্গার শব্দ শুনিতে পান। সম্মুখে তাকাইয়া দেখেন যে বাবার ফোটোর কাচটি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে ও ফোটোটি মেঝেতে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ শব্দ শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী নিকটস্থ রান্না ঘর হইতে ছুটিয়া আসেন, কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় ক্রিয়ার ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া লোকজন একত্র করেন ও দরজা ভাঙ্গিয়া দেখেন তাঁহার স্বামী আসনে উপবিষ্ট হইয়া পিঠে হাত বুলাইতেছেন, ফোটো পড়িয়া রহিয়াছে ও ভাঙ্গা কাচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে পারেন নাই কিন্তু দুই তিন দিন পরে বর্দ্ধমান আশ্রমে আসিলে বাবা তাঁহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলেন, "কিগো, খুব ক্রিয়া করছিলে যা হোক!"

শ্রীচন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায়—

পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত সবজজ।

আমি ১৯০৫ সালে যখন বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মুন্সেফ ছিলাম তখন তথাকার শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ধনী লোক আমার নিকট দেখা করিতে গিয়া কথা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তেশ্বর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম করিয়া বলেন যে, তিনি গুস্করা মোকামে ডাক্তারী কার্য্য করিতেছিলেন। অনেক পুলিস তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় রাধাবল্লভ বাবু তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন "আপনি ত' ডাকাতে কালী হয়েছেন, দেখ্‌ছি"। অর্থাৎ পুলিসের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হয়ত যথেচ্ছ উৎকোচ গ্রহণ করিবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এই কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম যে পুলিস কর্ম্মচারী সংসারে কাহারও নিকট ন্যূনতা স্বীকার করে না, কিন্তু ইঁহার নিকট কেন এত পুলিস কর্ম্মচারী শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে? সুতরাং ইনি নিশ্চয়ই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু মহাপুরুষ হইবেন। এই ধারণা করিয়া আমি ৮।১০ দিন মধ্যেই বড়দিনের বন্ধ উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। দেখা করিয়া আমার পূর্ব্ববর্ণিত প্রতীতি বদ্ধমূল হইল এবং আমি দীক্ষা-প্রার্থী হইলাম। বাবাজী তাঁহার গুরুদেবের নিকট আমাকে দীক্ষা দেওয়ার অনুমতি চাহিতে

সম্মত হইলেন এবং তাঁহার উত্তর আসিলে আমাকে জানাইবেন, বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইবে কি?" তিনি বলিলেন—"তোমার বাটী ঢাকা জেলা, আমার বাটী বর্দ্ধমান। তুমি এতদূর আসিয়া যখন দীক্ষা-প্রার্থী হইয়াছ, তখন ইহার মূলে কোনও যোগাযোগ নিশ্চয়ই আছে।" এই উত্তর শুনিয়া আমি আশান্বিত হইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলাম। ইহার প্রায় তিনমাস পরে চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে আমি পত্র লিখিয়া জানিতে পারিলাম যে আমাকে দীক্ষা দেওয়ার অনুমতি আসিয়াছে এবং ১৩ই চৈত্র আমার দীক্ষার দিন ধার্য্য হইয়াছে। আমার তখন ছুটী পাওনা ছিল না বলিয়া বাবাজিকে আমি কাটোয়া আসিয়া দীক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া গাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। বাবাজী ঐ গাড়ীতেই আমার বাসায় আসিয়া আমার দীক্ষার বন্দোবস্ত করিতে আদেশ করিলেন। আমি তাঁহার অসীম দয়ায় পরম প্রীতিলাভ করিয়া উৎসাহের সহিত দীক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমার ও আমার স্ত্রীর দীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

কিন্তু চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে আমি শূল-বেদনায় অত্যন্ত পীড়িত হইলাম। এমন কি, ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত আমার কোষ্ঠ বদ্ধ ছিল। ৩।৪ জন ডাক্তার অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়াও আমার কোষ্ঠ খোলাসা করিতে পারেন নাই। আমি এই সংবাদ বাবাজীকে জানাইলাম।

কিন্তু তিনি তখন বিন্ধ্যাচলে শ্রীযুক্তেশ্বরী ভৈরবী মাতাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমাকে লিখিয়া জানাইলেন,—"চিন্তার কোন কারণ নাই।" আমার ব্যারাম কঠিন বলিয়া আমি দুই মাসের ছুটী নিয়া কলিকাতা ডাক্তার দেখাইতে চলিয়া গেলাম। তথাকার ডাক্তার আমাকে দার্জ্জিলিং যাওয়ার জন্য বলিলেন, কিন্তু এরূপে আমি দার্জ্জিলিং যাইতে সাহস না পাইয়া গুষ্করায় বাবাজীর নিকট চলিয়া গেলাম। বাবাজী আমার যাওয়ার ২।৪ দিন পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। আমি যখন গুষ্করা যাই, তখন আমার অন্নপথ্য মোটেই হজম হইত না, সাগু খাইয়া থাকিতে হইত। গুষ্করা যাইয়া "আমি কি খাইব" জিজ্ঞাসা করায় বাবাজী আমাকে সন্ধ্যার পর তাঁহার প্রসাদ লুচি ও বুটের ডাল খাইতে বলিলেন—আমি তাহাই খাইলাম। তাহার পর যে তিন চারি দিন তথায় ছিলাম, অন্ন, লুচি, ডাল ইত্যাদি অতি সহজে হজম করিতে লাগিলাম। বাবাজী আমাকে বলিলেন,—"গুরুদেব দীক্ষার অনুমতি দিবার সময় লিখিয়াছিলেন যে, চৈত্র মাসের শেষ ভাগে তোমার অতি কঠিন ব্যাধি নিশ্চয় হইবে। সুতরাং তোমাকে ১৩ই চৈত্র তারিখে দীক্ষা নিতে হইবে। নতুবা আমাকে গুরু হত্যার পাতকী হইতে হইবে।" তিনি আরও বলিলেন,—"তুমি গাড়ী না পাঠাইলে আমাকে নিজে গাড়ী ভাড়া করিয়া তোমার বাটী যাইয়া ১৩ই চৈত্র তারিখে দীক্ষা দিতে হইত।" আমার যেরূপ কঠিন ব্যাধি হইয়াছিল তাহাতে

বাবাজীর পদাশ্রয় না পাইলে ঐ ব্যাধিতে ভবলীলা সমাধা হইয়া যাইত।

ইহার অনুমান ' ছয় বৎসর পরে পুনরায় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এক মাসের ছুটি নিয়া বাবাজীর নিকট বগুল গ্রামে গিয়াছিলাম। রাস্তায় আমার আমাশয় হয়। বাবাজীকে ঐ ব্যারামের কথা বলায় তিনি বলিলেন,—"তিন চারি মাস পূর্ব্বে গুরুদেবের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম যে দুর্গাকান্তের মৃত্যুযোগ দেখিয়াছি, তাহার মৃত্যুযোগ নিবারণের জন্য যেন পরমারাধ্যা ভৈরবী মাতারা ক্রিয়া করেন। তদুত্তরে গুরুদেব চিঠি লিখিয়াছেন যে তোমার জন্য যাহা করা হইতেছে তাহাই যথেষ্ট এবং তাঁহারা পূর্ব্বে না মরিলে তুমি মরিবে না।" এই কথা শুনিয়া আমি চোখের জল সংবরণ করিতে পারি নাই—বুঝিয়াছিলাম যে অতিশয় ভাগ্যবলে এরূপ পরম করুণাময় গুরুদেবের আশ্রয় পাইয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইতেছি।

বাবাজীর নিকট দীক্ষিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুড়ালজোড় নামক পীঠস্থানে আমার সহিত একজন সন্ন্যাসীর পরিচয় হয়। ঐ সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে আমার কাটোয়ার বাসায় আসিতেন এবং আমি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতাম। বাবাজীর নিকট দীক্ষিত হওয়ার পর ঐ সন্ন্যাসী একদিন মুর্শিদাবাদ জেলার কাণ্ডি মহকুমায় থাকা সময় আমার বাসায় গিয়াছিলেন।

আমি কার্য্যে অনবসর থাকায় সন্ন্যাসীকে আদর যত্ন করিতে পারি নাই। সন্ন্যাসী সেই জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন যে আমি তাঁহাকে অপমান করিয়াছি বলিয়া আমাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন। বাবাজী তদুত্তরে বলেন,—"দুর্গাকান্ত আমার শিষ্য। তাহার কেশাগ্রও সে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসী আমার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, নিজেই অল্পদিন পরে বিপন্ন হইয়া বাবাজীর সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

আমি সবজজ হইয়া অবসর প্রাপ্ত হওয়ার পর বাবাজীর সঙ্গে সঙ্গে নানা তীর্থস্থানে বাস করিতেছি। আমার যখনই ব্যারাম হওয়ার উপক্রম হয়, বাবাজী অলক্ষ্য ভাবে উহার উপশম করিয়া দেন। তাঁহার অতুলনীয় স্নেহের সহিত মাতৃস্নেহ অত্যন্ত স্পষ্ট প্রতীত হয়। এত দয়া ও স্নেহ জগতে দুর্লভ।

—— ঃ*ঃ ——

শ্রীযুক্ত লালমোহন রায় চৌধুরী—

মহাফেজ, হুগলী কলেক্টরী।

আমি দীক্ষিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে স্বপ্নে আমার উপাস্ত দেবতার আদেশ পাইয়াছিলাম। সেই সময় হইতে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত নানা স্থানে অনেক সাধু পুরুষের নিকট গমন করি। আমাদের কৌলিক গুরুবংশ নাই। আমাকে এক একজন এক এক রকম প্রবোধ দিতেন। একজন বলিলেন,—"তোমার পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী এখনও বর্ত্তমান। তুমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি কর, তিনিও তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তুমি কায়মনে তাঁহার সেবা কর। তোমার এখন আর অন্য দীক্ষার আবশ্যক নাই।" শুনিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। মাতৃসেবার ক্রটী আমার ছিলনা। মাতার স্বর্গ-লাভের পর পুনরায় চেষ্টা করি। তৎপরে একবার আর একজনের নিকট যাই। যাঁহার কাছে গিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন,—"বাপুহে, জাবর কাটাও।" আমি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আমি বুঝিতে পারিলাম না।" তিনি বলিলেন, "বাপু, গরুগুলো খাবার জিনিষ পেলেই ক্রমাগত খেতে থাকে, আর খাওয়া শেষ হইলেই জাবর কাটায় (চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে), তখন আর খায় না। তুমিও পেট ভ'রে গেলে যখন সেই রকম জাবর কাটাবে তখন চেষ্টা ক'রো। ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রহ্মচর্য্যের দরকার—শুধু আতপ

চাউল আর কাঁচকলা খেলেই হয় না।" আমি আমার স্ত্রী বিয়োগের পর থেকেই আতপ চাউল ও কাঁচকলা খাইতেছিলাম, তখন আমি সে কথা ঠিকই বুঝিলাম। পরমারাধ্যা মাতা-ঠাকুরাণীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী কতকগুলি নাবালক পুত্র কন্যা রাখিয়া স্বর্গগতা হয়। তখন আমার মন খুব খারাপ হওয়াতে অগত্যা কোনরূপেই শান্তি না পাইয়া সুরাদেবীর সেবা করিয়া মনকে ঠাণ্ডা করিতাম। কিন্তু মহাপুরুষের কথা শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল—সেই দিন থেকেই অন্যায় খাদ্যসমূহ একেবারে ত্যাগ করিলাম। কিছুদিন পরে তাঁহার সন্ধানে পুনরায় যাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন সন্ধান পাই নাই।

এইরূপে কিছুদিন কাটিবার পর শ্রীশ্রী৺পুরীধামে জনৈক সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁর কাছে যাতায়াত করি। তিনি বলিলেন,—"বাবা, যেমন মানুষের জন্ম ও মৃত্যু বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তেমনি দীক্ষা ও তাঁহার নির্ব্বন্ধ। তুমি ব্যস্ত হইলে কি হইবে? তবে হতাশ হইতে নাই, সব কাজেই আগ্রহ দরকার। তুমি পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, গায়ত্রীই ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব। তুমি দিনান্তে একমনে গায়ত্রী-দেবীর আরাধনা কর, তাহা হইলেই এখন হইবে।" কিছুদিন পরে শ্রীশ্রী৺কাশীধামে যাই। তথায় একজন সাধুর সন্ধান পাই। তাঁর কাছে গেলে তিনি কিছুক্ষণ গীতাপাঠ করেন এবং তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দেন। তিনি হিন্দুস্থানী, সুতরাং তাঁহার নিজ ভাষাতেই ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু আমি সবই বুঝিলাম। পরে তিনিও ঠিক পূর্ব্বমত উপদেশ

দিলেন। তবে মাত্র এইটুকু বলিলেন,—"বাবা, তুমি ব্যস্ত হইও না, স্বপ্নাদেশমত সদ্‌গুরু তুমি সত্বরই পাইবে। তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি তোমাকে দীক্ষিত করিবেন।"

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া যায়। আমার একটি ভ্রাতা ৺নীরদমোহন (বাবারই শিষ্য) তখন বর্দ্ধমানে পুলিশ ইন্‌স-পেক্টার ছিলেন, আমি তখন তাঁর বাসায় যাই। সন্ধ্যার পর তাঁর সহিত বাবার (অর্থাৎ শ্রীশ্রী৺ইষ্টদেবের) আশ্রমে যাই (তখন নূতন আশ্রম নির্ম্মিত হয় নাই)। আশ্রমে তখন অনেক লোক। বাবা আদেশ করেন,—"আগামী কল্য দিন স্থির করিয়া দিব, ঐ দিনে তোমার দীক্ষা হইবে।" পরদিন আশ্রমে গেলে দিন স্থির হয়। যেদিন দীক্ষার দিন স্থির হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বদিন রাত্রে আমার ভ্রাতার বাহিরের ঘরে আমি নিদ্রা যাইতেছিলাম, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। হঠাৎ বাহির হইতে ঘরের জানালায় আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। অনুমানে বুঝিলাম, আমাকেই ডাকা হইতেছে। অমনি উঠিয়া, দ্বার খুলিয়া দেখি, সামনেই শ্রীমূর্ত্তি। মূর্ত্তির কিছুই প্রভেদ নাই, প্রভেদের মধ্যে শুধু জ্যোতিঃ। স্পষ্ট চিনিলাম যে তিনিই আমার আরাধ্য। তিনি বলিলেন,—"একখানা আসন আন, তাহাতে বস, আমি এখনই এই স্থানে তোমায় দীক্ষিত করিব। যখন তুমি তোমার উপাস্য দেবতার আদেশ পাইয়াছ, তখন এই স্থানেই তাঁকে দেখ।" আমি খুব ব্যস্ততার সহিত দৌড়িয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি, ঘরে সকলেই

কথা কহিতেছে। বলিলাম,—"শীঘ্র একখানা আসন নিয়ে আয়"। তারা আমার স্বর শুনিয়াই উঠিয়া আসিল বটে, কিন্তু ইত্যবসরে আমি বাহিরে আসিয়া দেখি, ঘরের বারান্দায় কেহই নাই। সেই আলোটি চলে যাচ্ছে, আর তার মধ্যে একজন। আমি অতি কষ্টে সেই অন্ধকারে চলিলাম—বৃষ্টি মাথায়, শীতে শরীর জড়-সড়, গায়ে কোন আচ্ছাদন নাই, কিছুদূর গিয়াই পা আবদ্ধ হয়ে বসিয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে ভায়া আসিয়া আমাকে অজ্ঞান অব-স্থায় দেখেন ও কোলে করিয়া বাহিরের ঘরে আনেন। কম্বল চাপা দিয়া গুলের আগুন ক'রে সেক দিলে বহুক্ষণ পরে চৈতন্য হয়। সে জ্যোতিঃ মনে করিলে আমার এখনও ভয় হয়। তার পরদিনই আমার দীক্ষালাভ হয় এবং আমার উপাস্য দেবতা, যাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন পাই, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হই। তখন ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা আমাকে নানারূপ উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁদের কথা মনে পড়ে।

আমি একবার বর্দ্ধমান আমার ঐ ভাইয়ের বাসায় যাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাবার ওখানে থাকার পর ফিরিয়া আসিবার সময় পথ ভুলিয়া বহুদূর চলিয়া যাই। পথে লোক নাই, যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিব। ভয় হইল, মনে হইল আমি ক্রমাগতই চলিতেছি। একবার ভাবি ভায়ার বাসাত এতদূরে নয়, এত সময়ও লাগে না। ফিরে এই রাস্তা ধরেই আবার বাবার কাছে যাই, সেখান থেকে একজনকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফিরে আসব। আবার ভাবছি, ফিরে গিয়ে আবার কোন্ পথে যাব ? "ভগবান কি করি, বাবা কি করি" বলিতেই হঠাৎ

একজন পুলিস কনেষ্টবল এসে বলিল,—"আপ্ এতনা রাতমে হিঁয়া কা কর্তা হ্যায়"। পুলিস দেখেই আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "বাপু, হম চোর নহি। তুম নীরোদ বাবু পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকো জানতা হ্যায়!" সে বলিল—"হাঁ বাবু খুব।" আমি বলিলাম,—"হাম্ উন্‌কা ভাই। হম্ উন্‌কা বাসামে জায়েঙ্গে। লেকিন ডেরা মালুম হোতা নহি।" তখন সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। পথে আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—"হমারা নাম দেওকী নন্দন।" বাসায় এসে ভায়াকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। তারাও ভাবিতেছিল। পরদিন ভায়া অনুসন্ধান করেন, কিন্তু ঐ নামে তখন পুলিসে কেহ ছিল না।

আমার ঐ ভ্রাতার কন্যার বিবাহে আমি ছেলে মেয়ে সহ ভায়ার বাসায় আসি। আমি তৎপূর্ব্বে আশ্রমে একবার রন্ধন করি। বাবার মুখে বোধ হয় ভাল লাগিয়াছিল, তাই তিনি এবারও বলেন—আমার রান্না খাবেন। আমি রসুই ঘরে ছিলাম, মেয়েরা বাবাকে নিয়ে বিরক্ত করিতেছিল। আমার বড় মেয়ে প্রথম একবার তাদের কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে, পরে শ্রীশ্রী৺পুরীধামে (যেখানে তারা বর্ত্তমানে বাস করিতেছে) একজন মৈথিলী ব্রাহ্মণের নিকট দ্বিতীয়বার দীক্ষিতা হয়। বাবা আমার ঐ মেয়েকে তার প্রথম ও দ্বিতীয় গুরুর নাম ধাম ও কি মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছে বলিয়া দেন। সে আশ্চর্য্য হইয়া আমাকে বলিতে আসে। বাবা পরে অনেক কথা বলেছিলেন। তারা বাবাকে দাদামশায় বলে। আমার

ঐ বড় মেয়েটীর টাইফয়েড্ জ্বর হইয়া একটী চক্ষু খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সে জন্য সে বলেছিল,—"আমি যে এই চোখটাতে দেখতে পাইনে। কৈ দাদামশায় কেমন, তুমি ভাল করিতে পার, দেখি।" চোখটী বহুকাল হইল নষ্ট হইয়াছে, এখন কিন্তু ঐ চোখে সে দেখতে পায়, তবে অল্প। বাবা যে ইচ্ছা করিলে যেখানে যে কোন বিষয়ে হউক না কেন জানিতে পারেন, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর সম্বন্ধে যাহাই বলি বা করি, ধৃষ্টতা মাত্র। তিনি আমার জ্ঞান বুদ্ধি এবং কল্পনারও অতীত।

তিনি কতবার সাক্ষাতে ও পরোক্ষে তাঁর এই অধম শিষ্যকে যে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করেছেন তাহারই দুই একটি ঘটনার উল্লেখ :—

আমি একবার অফিস বন্ধের সময় বর্দ্ধমান যাই। রাত্রে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ফিরে যাবে কবে ?" আমি বলিলাম,—"কাল সকালেই যাব"। আমি যখন বাসায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি তখন আমার একটী ভাইঝি বলে,—"জেঠামহাশয়, মা বল্‌ছেন এ বেলাটা খেয়ে দেয়ে ও বেলা যাবেন।" সুতরাং বাসায় ফিরে না এসে বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিতে যাই। কিন্তু যাওয়া মাত্র বাবা বলিলেন—"কৈ, তুমি সকালে যাবে, বলে গেলে না ?" অমনি মনে সন্দেহ হল, আর কোন কথা না বলেই একেবারে ষ্টেষনে এলাম। তখন গাড়ীখানি ষ্টেষনে দাঁড়িয়ে আছে। টিকিট নিয়েই

গাড়ীতে উঠে বাসায় এসে পৌঁছিবা মাত্র ঝি বলিল,--"বাবু ৩।৪ জন বাবু ও চাপরাশী দুই তিন বার এসেছে।" শুনেই অফিসে এসে দেখি, খৃষ্টানদিগের বিবাহের রেজেষ্টারী চেয়ে পাঠাইয়াছে। অফিসের অন্য আমলারা দুয়ার খুলিতে পারিতেছে না, আমি আসিয়াই চাবি নিয়া বইখানি দিই। বইখানি ঠিক সময়ে না পাইলে অবশ্য গোলযোগ হইত।

একবার বাবা তাঁহার একটী শিষ্যকে আমার নিকট পাঠান। শিষ্যটী খবরের কাগজে একটী নোটীশ দেখেন যে জামিন দিলে একটী জমিদারের সরকারে তাঁহার চাকুরী হয়। টাকা দরকার হওয়ায় লোকটী আমাকে বলিয়াছিলেন,—"টাকাটা বাবাই দিয়াছেন।" বাবা যখন টাকা দেন তাঁহাকে বলিয়া দেন,—"আগে লালমোহনের সঙ্গে দেখা করিয়া তবে অন্য বন্দোবস্ত করিবে।" লোকটি আমাকে এসে চাকুরীর কথা বলিতেই আমি বুঝিলাম এবং সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম। আমি পূর্ব্ব হইতেই ঐ ব্যাপার শুনিয়াছি এবং ২।১ জন যে গোলযোগে পড়িয়াছে, তাহাও জানি। আমি তাঁহাকে নিষেধ করিতেই তিনি বলিলেন,—"বাবাও ঐ কথা বলিয়াছেন।" পরম্পরায় অবগত হই, আমার গুরুভাইটী আরও দুই এক স্থানে সংবাদ নিয়া আমার কথা ও বাবার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমি কোন বিষয়ে সংবাদ লই না, যাহাতে আমার সংশয় নাই সে সম্বন্ধে অনু-সন্ধান করি না, তবে এটি যেন কার্য্যগতিকে পূর্ব্বেই আসিয়া-ছিল। সুতরাং বাবার কাছে আমাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই।

একবার আমার মেজ মেয়ে রাত্রে রসুই ঘরে রসুই করিতে থাকাকালে কোথা থেকে একটি বিষধর সর্প আসিয়া তথায় ঢোকে। মেয়েটি যে চৌকীতে ব'সে রাঁধিতেছিল সাপটি তার নীচে দিয়ে গিয়া যেখানে হাঁড়ী থাকে সেখানে উঠিয়া প্রকাণ্ড ফণা ধরিয়া দাঁড়ায়। মেয়েটি নিতান্ত ছেলে মানুষ। বামুনঠাকুর আসেন নাই, অগত্যা তাহাকে কোন গতিকে রান্না করিতে হইতেছে। সে ভয়ে কাঁপিতেছে, কথা কহিতে বা উঠিয়া পলাইতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ পরে সাপটি আপনিই আস্তে আস্তে ফণাটী নামাইয়া নালীর ভিতর যেমন যাইবার জন্য মুখ প্রবেশ করাইয়াছে, অমনি মেয়েটি কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া "বাবা" বলিয়া উঠিল। আমি দৌড়িয়া গিয়া দেখি, সাপটি চলিয়া যাইতেছে।

একবার আমার তিনটি কন্যা একটি ঘরে শুইয়াছিল। অধিক রাত্রে তারা যখন বাহিরে আসিতে যায়, দুয়ার খুলিয়াই সামনে একটি মূর্ত্তি দেখে। তারা ভয়ে দুয়ার দেয় এবং ব'সে রাত্রি কাটায়, এবং অগত্যা ঘরের ভিতরই প্রস্রাব করে। ভোরে উঠে দুয়ার না খুলেই জানালা দিয়ে আমাকে ডাকে ও বলে,—"দাদা-মশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। আমরা বেরোতে পারছি না।" বুঝিলাম ঘটনা প্রকৃত, কারণ গন্ধটি তখনও আছে। উপরোক্ত দুইটি ঘটনাই বাবা মেয়েদের সঙ্গে দেখা হ'লে বলেছিলেন, আর তা নিয়ে অনেক আমোদও করেছিলেন।

একবার আমার শালী (মৃত জগৎচন্দ্র রায় মাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী) আমার বাসায় গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে আমার ছেলে মেয়েদের

দেখিতে আসেন। আমার ছেলে (ছেলে বুদ্ধিতে) উপরের ঘরের দেওয়ালে পেনসিল দিয়ে একটি মানুষের চেহারা আঁকিয়া তার লম্বা দাড়ী ও গোঁফ করে। আমার শালী তাকে বলেন,—"বটু, তোর বাবার গুরুঠাকুরকে বুঝি এঁকেছিস্, বেশতো লম্বা দাড়ী।" ঐ দিন রাত্রে বড় গরম হওয়ায় তিনি ঘরের ভিতরে বিছানায় না শুয়ে, বারান্দায় শুয়ে ঘুমাইতেছিলেন, শেষ রাত্রে বাহিরে যাইবার সময় দেখেন, বাহির থেকে শিকল বন্ধ, আর তিনি কাঁপিতেছেন, আর বলিতেছেন,—"আর বলব না রে, আর বলব না"। ঘর খুলিতেই গন্ধ পাইলাম, অনেকক্ষণ পরে তার কাঁপুনি থামিল আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,--"আমার ৬০।৬২ বৎসর বয়স, এমন ত দেখি নাই। একবার তাঁকে সশরীরে দেখা। আমি সেই হাসিমুখখানা দেখব।" কিন্তু তাঁর ভাগ্যে হয় নাই।

ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত আমার একটী কন্যার ও পুত্রবধূর পীড়ার সময় বাবাকে ক্রমাগত ডাকিয়া যে দিন ছায়া-মূর্ত্তি ও গন্ধ পাই, সেইদিন থেকেই তাদের আরোগ্যের পথে দেখি, কিন্তু আমার একটী নাতী ও নাতনীর পীড়াকালে কত ডাকিয়াও বাবার কোন আভাস বা ইঙ্গিত না পাওয়ায় মনে মনে স্থির জানিতে পারি যে আশা নাই।

গত বৎসর আমার একটী ভাই ৺ললিতমোহন (বাবারই শিষ্য) কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া কলিকাতা হইতে রাঁচীতে হাওয়া পরিবর্ত্তনে যায়। যাইবার সময় পত্র লেখে,—"হাওয়া বদলাইতে রাঁচি যাইতেছি।" তিন মাস তথায় থাকে, কোন সংবাদই নাই।

রাঁচির ঠিকানাও জানি না, পরে অগত্যা বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে একদিন রাত্রে আহ্নিকের সময় বিশেষ ব্যাকুল হইলে হঠাৎ ভাইয়ের সেই সময়ের অবস্থা সামনে শয়নাবস্থায় দেখিতে পাই। তৎপর দিন প্রাতেই অগত্যা কলিকাতায় বাড়ীতে যাই। গিয়া দেখি—যাহা দেখিয়াছি ঠিক তাই। দুই দিন পূর্ব্বে এসেছে, আর দুই দিন পরেই ভাই আমার মারা যায়।

আমার গুরু ভাই ভগিনী ও মাতৃগণের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন যেন তাঁরা ও অন্যান্য পাঠক পাঠিকাগণ আমাকে বাতুল বা বাচাল না বলেন। ভগবানকে ব্রজ গোপীরাই চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁরা বহু লাঞ্ছনা অপবাদ সত্ত্বেও সেই জগৎপতি ভগবানকে পতি বলিয়াই অটল ভাবে বরণ করিয়াছিলেন। আমি যদিও এখনও তাঁদের ন্যায় বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারি নাই, তথাপি তাঁর শ্রীচরণে আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আমার ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণের চরণে নিবেদন ও কাতর প্রার্থনা যেন তাঁদের আশীর্ব্বাদে ও অনুকম্পায় আমার ঐ বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁর চরণে অচলা থাকে।

শ্রীলালমোহন রায় চৌধুরী।

শ্রীলীলাবতী গুপ্তা

পোঃ মাণ্ডলা, মধ্যপ্রদেশ।

একদিন কাটোয়ার আমার সই বগলাদের বাসায় একটী ঘরে আমরা সকলে বসিয়া আছি। পরমারাধ্য গুরুদেব খাটের উপর শুয়ে আছেন, আমি তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। দেখছি তাঁর গায়ে যতগুলি মাছি বা মশা বসছে সবগুলিই মরে যাচ্ছে। তাই দেখে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে আর সকলকে বল্‌লাম,—"কেমন মজা দেখ।"—তাই শুনে বাবা বল্‌লেন, "আরও দেখবি?" এই বলে যেমন উঠলেন, দেখি, বিছানায় অসংখ্য ছারপোকা মরে রয়েছে। আমরা সকলে বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। তাই দেখে বাবা বল্লেন,—"এতো কি? সে বার কেউটে সাপ আমার পেট্‌টায় কাম্‌ড়ে ধরেছিল। যেমন ধরা অমনি উল্টে পড়া,—সকলে দেখল সাপটা একেবারে ম'রে গিয়েছে।" এই বলেই পেট্‌টা খুলে আমাদিগকে দেখালেন। দেখলাম, পেটের এক জায়গায় দাগ রয়েছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে, সেখানটা গর্ত্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"আপনার কিছু হয় নি?" সকলেই বড় আশ্চর্য্য হলো। তাঁর যে কি অসীম শক্তি তা কে বুঝবে? আমার বাবা বল্‌তেন যে তাঁর শরীরে তাড়িত-শক্তি এত বেশী যে জীব জন্তু তাঁর স্পর্শে জ্বলে পুড়ে যায়, কেউ টিঁকতে পারে না।

গুরুদেবের নাভির আধ হাত উপরে হাত রাখলে ঠিক বোঝা যেত যেন হু-হু করে একটা বাতাস বেরুচ্ছে, আর সেই বাতাসটা সুগন্ধে ভরা। তাঁর গায়ে সেই রকম গন্ধ সময় সময় খুব পাওয়া যায়।

আমাদের বাসায় সন্ধ্যার সময় সকলে বসলেই ছাদের উপরে খড়মের শব্দ হতো। আমার বাবা বলতেন,—"গুরুদেব এসেছেন, সকলে প্রণাম কর।" বল্‌তে বলতেই সেই জায়গা টা সুগন্ধে ভরে যেত, ঠিক তাঁর গায়ের গন্ধ।

সইদের বাড়ীতে আনারস হয়েছিল, একদিন আমরা সেই আনারস তুলে সকলে খেয়েছিলাম। ঠিক তার দুইদিন পরেই গুরুদেব সইকে লিখেছেন,—"আনারসটা নিজেই তুল্লে, নিজেই খেলে।" আমরা ত অবাক্। এই রকম ভাবে তিনি অনেক বার আমাদিগকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁহার অলক্ষ্যে আমরা কোন কাজ করলেও তিনি জানিতে পারেন।

একদিন গুরুদেব, আমার বাবা ও আর চার পাঁচজন শিষ্যসহ জুরনপুরে গিয়াছিলেন। ফেরবার সময় তাঁদের সঙ্গে জুরনপুরের এক সন্ন্যাসী তারা ক্ষ্যাপাও আসেন। এঁরা যাবার তিন চারিদিন পূর্ব্বে জুরনপুরের পূজারী বামুনের সঙ্গে তারা ক্ষ্যাপার কোন কারণে খুব ঝগড়া ও মারামারি হয়। তার ফলে তারা ক্ষ্যাপার মাথা ফেটে যায়। সে মাথায় যে পটী বেঁধে ছিল সেই রক্তমাখা পটীটী একটি ঘটির ভিতর করে সঙ্গে নিয়ে আসে, তা এঁরা কেও জান্‌তেন না। আসতে আসতে

উদ্ধানপুরে মরা ঘাটে মরা পুড়ছিল, ভয়ানক দুর্গন্ধ, সমস্ত শিষ্যই গন্ধে অস্থির হয়ে উঠেন। কেউ বমি করার মত করেন, কেউ নাকে কাপড় দেন,—এই রকম নৌকার ভিতর একটা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। এমন সময় গুরুদেব হাসতে হাসতে সকলকে বল্লেন, "কিগো, বড় গন্ধ বেরুচ্ছে নাকি? দেখ দেখি, কেমন সুন্দর গন্ধ। মা ভাগীরথী পর্য্যন্ত আনন্দে কল্লোল কর্চ্ছেন, আর তাঁর জলেও সুন্দর গন্ধ হয়েছে, দেখ।" এই বলেই নৌকার উপর থেকেই এক আঁচল জল নিয়ে সকলের নাকের কাছে ধরলেন। জলে কি সুন্দর গন্ধ, চারিদিক সুন্দর সুগন্ধে ভরা, আর জলও যেন আনন্দে নৃত্য কর্‌ছেন। এমনি ভাবে কল্ কল্ শব্দে ঢেউ উঠছে যে নৌকার মধ্যে একটা আনন্দের রোল পড়ে গিয়েছে। সকলেই এক বাক্যে বল্‌ছেন, মা আজ তাঁর প্রিয় পুত্রকে বক্ষে ধারণ করেছেন, তাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে সুগন্ধ বিস্তার করে উল্লাসে নৃত্য কর্‌ছেন। উদ্ধানপুর কাটোয়ার গঙ্গায় কখনও উজান ভাটি নাই, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ গঙ্গা এমন উজান বহিতে লাগিল যে নৌকা টল্‌মল্ করতে লাগল। ভয়ানক তুফান, নৌকা ডুববার উপক্রম, সকলেই অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। তারা ক্ষ্যাপা মালকোচা মেরে তৈরী হচ্ছেন যে নৌকা ডুবলেই লাফাইয়া পড়িবেন, নৌকা কাত হ'য়ে জল কল্ কল্ শব্দে নৌকার ভিতর ঢুকতে লাগ্‌ল। গুরুদেব অচল অটল হয়ে বসে আছেন। কারো কোন অনিষ্ট হ'লো না। কিন্তু

তারা ক্ষ্যাপার ঘটির ভিতর থেকে পটিটা বেড়িয়ে জলের সঙ্গে ভেসে গেল। ঘটিটা যেমনই তেমনই থাকিল। তারা ক্ষ্যাপা মহাব্যস্ত হয়ে পটিটা ধরবার চেষ্টা কর্‌লে, নিজে না পেয়ে বিব্রত হ'য়ে মাঝিদের বল্লে, "ওরে আমার মহামূল্য জিনিষ ভেসে গেল, ধর্‌ ধর্‌।" মাঝিরাও তাই মনে করে সেটা ধরবার জন্য চেষ্টা কর্‌ছে, এমন সময় গুরুদেব হেসে বললেন— "যাক্‌ যাক্‌, ও ধরবার দরকার নাই, ও কোন কাজের জিনিষ নয়। যা হয়ে গিয়েছে যাক্‌। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে ও সব মনে রাখা ভাল নয়।" পরে আমার বাবা প্রভৃতি শিষ্যদিগকে বল্লেন, "পূজারী ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তাই রক্ত মাখা পটিটা যত্ন করে রেখেছিল। যত দেখ্‌তো ততই ওর রাগ বাড়তো, আর প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছা হ'ত। ওটা কাটোয়া নিয়ে যাচ্ছিল যে ফৌজদারীতে দেখিয়ে নালিশ ক'রে বামুনকে জব্দ কর্‌বে। তাই মা গঙ্গা ওটা ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। তোমাদের কোন ভয় নেই, দেখ মা স্থির হয়েছেন, আর কোন তুফান নাই।" সত্যই মা ভাগীরথী তখন আর কোন রকম চঞ্চলা নেই— একেবারে স্থিরা ধীরা শান্ত-সলিলা। সকলে বললেন,—"এ মায়ের ইচ্ছায় হয়নি, আপনার ইচ্ছাতেই হয়েছে।" ধন্য মহাপুরুষের শক্তি; কারোই কোন বিপদ আপদ হলো না, সকলেই নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন বাসায় এসে পৌঁছিলেন।

কাটোয়ায় আমাদের বাবার বৈঠকখানায় টেবিলের উপর কতকগুলি খোপওয়ালা কাঠের তৈরী একটা পায়রার খুপি

ছিল। সেই খোপগুলির ভিতর বাবার আফিসের কাগজ পত্র থাকৃতো। একদিন বাবা সেই কাগজ পত্রগুলি আলমারির ভিতর বন্ধ করে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। যাবার সময় আমার মেজ ভাইয়ের অসুখ দেখে গিয়েছিলেন, তার পিঠে ঘা হয়েছিল। বাবা গুস্করায় গিয়ে দুই দিন ছিলেন। একদিন সকাল বেলায় উঠে চুপ করে খুব বিমর্ষ হ'য়ে আমার ভাইয়ের জন্য ভাবছিলেন, এমন সময় গুরুদেব আহ্নিক করে উঠেই বাবার কাছে এসে বল্লেন,—"কিগো, কি ভাবছো ? আমি বাপু আহ্নিক করতে করতে তোমার বাসায় চলে গিয়েছিলাম, দেখলাম সবাই বেশ ভাল আছে। তবে তোমার ছেলেটীর পিঠে কতকগুলি ঘা হয়েছে দেখ্‌লাম। সে গুলো ভয়ানক পেকে উঠেছে।" বাবা অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন দেখে তিনি বল্লেন,—"হ্যাঁগো, বৈঠকখানায় টেবিলের উপর যে খোপগুলায় তোমার কাগজপত্র থাকৃতো, কৈ তার ভিতর তো সে গুলো দেখলাম না। সে গুলো তুলে রেখেছ বুঝি ?" বাবা বল্লেন,—"হ্যাঁ, ছেলেপিলে নষ্ট করে দেবে বলে সে গুলো আল-মারিতে বন্ধ করে রেখে এসেছি।" তখন তিনি বল্লেন,—"হ্যাঁ, সে জন্যই দেখতে পেলাম না।" তারপর বাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবা, খোকার পিঠে ঘা গুলা কি রকম ? কোন ভয় নেই তো ?" তিনি বল্লেন—"না, ভয় নেই। ও গুলো গরল হয়েছে। তা হলেও তুমি আজই ফিরে যাও, আর বর্দ্ধমান যাবার দরকার নাই। মেয়েরা সব ভয় পাচ্ছে।" বাবা

বর্দ্ধমান না গিয়ে কাটোয়ায় ফিরে এলেন। বাসায় এসে আমাদিগকে বল্লেন,—"আমার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই খোপে কাগজপত্র নাই, সেইটা বল্লেন, কেন না তিনিতো সে কথা জানতেন না যে কাগজপত্র তুলে রেখে গিয়েছি।"

যখন আমরা কাটোয়ায় ছিলাম তখন আমি ছেলে মানুষ ছিলাম। গুরুদেবকে সে সময় আমি 'দাদা গুরুদেব' বলে ডাকতাম। আমি, সই ও আমার আরও সঙ্গিনী, সকলে মিলে তাঁর কাছে গেলেই তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক রকম খেলা কর্‌তেন। কখনও তাঁর দাড়ি থেকে অসংখ্য ফুল ঝর্ ঝর করে পড়তো, আর তিনি আমাদের গায়ে ছুড়ে ছুড়ে ফেল্‌তেন। কখনও বা আমাদের প্রত্যেকের কাপড়ের খুঁট মুঠার মধ্যে চেপে ধরতেন। এক একজনার কাপড়ে এক এক রকম ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধ হতো, সকলেই বলতো আমার গন্ধ ভাল, কিন্তু সব গন্ধই রকমারি সুন্দর। আবার কখনও বা আমাদের হাতে গায়ে চিমটি কেটে দিতেন, আর তাঁর নখ দিয়ে আতর বেড়িয়ে সেই জায়গাটায় লেগে যেত। আমার সেজ ভাইয়ের সর্ব্বাঙ্গে এক এক জায়গায় চিমটী কাটতেন, আর এক এক রকম গন্ধ হতো। সকলে তাঁকে আতরে বাবু বলতো, আর কোলে করে তাঁর গা শুঁকতো।

তারপরে আমার বাবা বর্দ্ধমান বদলি হন, তখন আমাদের বাসা বীরহাটে। আমার মেজো ভাই তখন কাতর হয়, একেবারে ডবল নিমোনিয়া। ভাইটীকে নিয়ে আমরা সকলেই বড় বিব্রত হয়ে পড়লাম। বিকারের ঘোরে

সে এতই অস্থির হ'ত যে কেহই তাকে সাম্‌লে রাখতে পারত না। মা বাবা হতাশ হয়ে পড়লেন। যখন সে বিকারের ঘোরে কখনও উঠে বসে পড়ত আবার কখনও দাঁড়িয়ে পড়ত, তাকে তখন কেউ সামলাতে পারতেন না। আমি সেই সময় গুরুদেবের ফটোখানি তার মাথায় চেপে ধরে বলতাম, "ভয় কি দাদা? এই দেখ দাদা গুরুদেব তোমার মাথায় চরণ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।" তখনই মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত আড়াই বছরের ছেলে এমন শান্তভাবে শুয়ে পড়ত যে সে যে ব্যাধিগ্রস্ত তা মোটেই মনে হ'ত না। এই ভাবে পনর দিন কেটে গেল। তার বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল, তিন দিন খুব বাড়াবাড়ি হয়, শেষ দিন রাত্রি আর কাটেনা—এমন অবস্থা হল। খুব ভোরে বাবা আমার বড় ভাইকে ডেকে বল্লেন,--"তুমি সকালেই একবার গঙ্গানারায়ণ ডাক্তারকে নিয়ে এসগে, তিনি শিশু চিকিৎসা খুব ভাল করেন। জীবনের আশা তো করা যায় না, তবুও একবার তাঁকে দেখান যাক। তারপর ভাগ্যে যা আছে তাত হবেই।" আমার বড় ভাই সকালেই ডাক্তার আন্‌তে বেড়িয়ে গেল। আমরা সকলেই ডাক্তারের প্রতীক্ষাতে আছি, মা বাবা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় আমার বড় ভাই টম্‌টম্‌ নিয়ে ফিরে আসছে। দেখা গেল ডাক্তার না এসে তাঁর বদলে গুরুদেব গাড়ীতে বসে আছেন। আমার মা আনন্দে বলে উঠলেন, "একি, এতো ডাক্তার নয়, এ যে বাবা আসছেন। ছেলে সাক্ষাৎ গঙ্গানারায়ণ নিয়ে এলো।" বাবা বল্লেন,—"তবে আর কোন ভয়

নেই।” বল্লেই তিনি বাইরে বেড়িয়ে গেলেন। গুরুদেব গাড়ী থেকে নেমেই বল্লেন,—“কিগো তোমার ছেলে কেমন আছে?” বাবা সমস্ত তাঁকে বল্লেন, তিনি বল্লেন,—“চল দেখিগে।” তিনি ঘরের ভিতর এসে খোকার কাছে দাঁড়ালেন। আমি আনন্দে তাঁর চরণের ধুলা নিয়ে ওর সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিলাম। তাঁর চরণামৃত নিয়ে তাকে খাইয়ে দিলাম। তারপর গুরুদেব তাঁকে ভাল করে দেখে বল্লেন—“কোনও ভয় নেই। এ ছেলের কিছু হবে না। এ ছেলের যে জীবন হরণ করবে, এমন যমের এখনও সৃষ্টি হয় নাই।” তারপরেই আমার বাবাকে বল্লেন,—“বাপু, আজ কয়দিন হলো আমি কাটোয়া গিয়াছিলাম, আহ্নিক কর্‌তে কর্‌তে দেখলাম, তোমার ছেলের এমনি অসুখ। তিন রাত্রি আমি মোটেই ঘুমাই নি, এই তিন দিন আমাকে কঠোর ক্রিয়া করতে হয়েছে। তারপর দেখলাম, আর থাকা চলে না, তাই কাল সন্ধ্যায় উট-গাড়ীতে বেড়িয়ে পড়লাম। সকালে গাড়ী থেকে নেমেই দেখি, বিষ্ণু টম্‌টম্ নিয়ে ঐ দিকে যাচ্ছে। তখন আমি তাকে ডেকে খোকার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে আমাকে সমস্ত বল্লে। তখন আমি সেই গাড়ীতে চড়েই তোমার বাসায় এলাম। যাক্, আর কোন চিন্তা নেই। তা হলেও যখন গঙ্গানারায়ণ ডাক্তারকে আনতে পাঠিয়েছিলে, তখন তাঁকে এনে একবার দেখাও।” তাই শুনে আমার বাবা বল্লেন, “আর কেন? যখন আপনি দেখলেন, চরণ ধূলি দিলেন, আপনি ওর জন্য যখন ক্রিয়া করেছেন, তখন আর ওর জন্য আমার কোনই

ভয় বা চিন্তা নেই। আর ডাক্তারের আনার প্রয়োজন কি ?" তাই শুনে গুরুদেব বল্লেন---"তা হলেও রোগের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কিছু অর্থ-ব্যয় করা কর্ত্তব্য। অতএব ডাক্তারকে আরও কিছু অর্থ দেওয়া দরকার।" এই বলেই তিনি গুস্করা চলে গেলেন। তাঁর যাবার পর থেকেই খোকা একটু একটু করে ক্রমেই সেরে উঠতে লাগল, আর কথা কইল।

কিছুদিন পরেই গুরুদেবের ছেলেদের উপনয়ন উপলক্ষ্যে আমি বণ্ডুল গেলাম। সেখানে যাবার ৪।৫ দিন পরেই একদিন সকালে দেখি, আমার বাবা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে উপস্থিত। তাঁর মুখে শুনলাম আমার মেজো ভাইয়ের উপরেই যে বোনটী তার বড় অসুখ। আমি যে দিন বর্দ্ধমান হতে এসেছিলাম, সেই দিন ভোর থেকে তার জ্বর হয়। তারপর ক্রমেই বাড়ছে, অতএব আজ আমাদিগকে বাড়ী যেতে হবে। গুরুদেব সমস্ত শুনলেন, কিন্তু কিছু বল্লেন না, চুপ করে থাক্‌লেন। তবে আমাকে বাবার সঙ্গে সেই দিনই পাঠিয়ে দিলেন। আমরা যাবার পরেই বোনটার অসুখ ক্রমেই বাড়তে লাগল। সেবারেও আমরা বণ্ডুল হ'তে আসার দুই দিন পরেই গুরুদেব এলেন। আমরা তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে বোনটীকে দিতে গেলাম। তাতে তিনি বল্লেন, "ওকে আর পায়ের ধূলা দেওয়া না দেওয়া দুইই সমান।" তারপর ঠিক সন্ধ্যার সময় আমাকে বল্লেন—"এক গাড়ু জল দে, আমি বাইরে বাহ্যে ফিরতে যাব।" আমি এক গাড়ু জল দিলাম। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঘুরে এলেন। কিন্তু গাড়ুর জল যেমনি,

তেমনি আছে। আমি বল্লাম,—"একি ? জল কি খরচ করেন নি ?" তিনি বল্লেন,—"না, আমি ভূত তাড়াতে গিয়াছিলাম।" আমরা যে বাসায় ছিলাম, সেটায় ভূতের উপদ্রব ছিল। তার পরেই তিনি গুষ্করা চলে গেলেন. সেখানে গিয়েই কেদার দাদা প্রভৃতির কাছে বলেছিলেন রজনীর মেয়েটী মারা যাবে।

গুরুদেব সে দিন দুপুর বেলায় আমাদের বাসায় বসে আমাদিগকে একটী সুন্দর গল্প বলেছিলেন। তিনি চলে গেলে আমি আমার বাবার কাছে সেই গল্পটা সমস্ত বলি। বাবা শুনেই মাকে বল্লেন, "তোমার মেয়েটী বাঁচবে না, গুরুদেব গল্পচ্ছলে তোমাদিগকে বলে গিয়েছেন, তোমরা বুঝতে পার নি।" তারপর গুরুদেব যাবার পরদিন বৈকালে আমার সে বোনটী মারা যায়।

বণ্ডুলের প্রতিষ্ঠিত বাণলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলা তাঁহার মস্তকের ভিতর ছিলেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তিনি নাক দিয়ে তাঁকে বাহির করতেন, তারপর পূজাদির পর আবার সেই রকম ভাবে মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দিতেন। সেই রকম নাকের ভিতর দিয়ে মাথাটা ঝাঁকড়াতেন, আর মনে হতো তাঁর ব্রহ্মতালুতে ঠক্ করে শব্দ হলো। আর একবার দেখেছিলাম একটী মড়ার দাঁতের মালা তাঁর কাছে ছিল। কোন সন্ন্যাসী নাকি তাঁর কাছে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। সে মালাও তাঁর মাথার ভিতর ছিল। মাঝে মাঝে তাকে বার করে ছোলাভাজা মদ ইত্যাদি না দিলে সে কড়মড় করে শব্দ করতো। তার পরেই গুরুদেব বর্দ্ধমানে একটী আশ্রম করেন। ইহা পুরাতন আশ্রম। তিনি গুষ্করা থেকে

মাঝে মাঝে এসে এই আশ্রমে থাকতেন। আশ্রমের পিছনে একটী পুকুর ছিল, তার অপর পারেই তখন আমাদের বাসা। তিনি যখন আসতেন, তখন আমি প্রায়ই আশ্রমে থাকতাম।

একদিন নেপাল বাবু এসে আমাকে বল্লেন,—"আমি কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি, আশ্রমে আর কেউ নেই, বাবা একা আছেন, তুমি আশ্রমে যাও।" আমি, আমার আর একটী বোন, আমাদের বাড়ীর আর একটী মেয়ে ও আমাদের বাসার পাশের বাড়ীর একটী মেয়ে,—আমরা চারজনে আশ্রমে গেলাম। বাবা তখন একটি তানপুরা নিয়ে একা বসে বসে গান কর্‌ছিলেন,—"মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়, হবে গো জননি জানি সমুদয়", এই গানটী গাচ্ছিলেন। আমাদের মনে হল স্বয়ং কৈলাসপতি। আমাদিগকে দেখেই হেসে উঠলেন, বল্লেন,—"কি গো, এস সব।" এই বলেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমরা সকলে গিয়ে তাঁর কাছে বস্‌লাম। আমাকে বল্লেন,—"মাথার চুল টেনে দাও।" আমি মাথার চুল টেনে দিচ্ছি, আমার বোন ও আমাদের বাড়ীর মেয়েটি পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর প্রতিবাসিনী মেয়েটি তাঁর পাশে বসে আছে। নানা রকম গল্প হাসি খেলা ইত্যাদি হচ্ছে, এমন সময় বেরির হাতে যে একটি খুব বড় চাবি ছিল সেই চাবিটি তার হাত থেকে নিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"এ কিসের চাবি?" সে বল্লে,—"আমাদের ঘরের তালার চাবি।" তাই শুনে বাবা বল্লেন,—"চাবিটা তো আমি খেয়ে ফেলেছি, তবে কি হবে?" আমরা কেউ সে কথা বিশ্বাস করলাম না। সকলেই

বল্লাম,—"হাঁ, চাবি আবার কেউ খেতে পারে ?" তিনি হেসে বল্লেন,—"বিশ্বাস হলো না, দেখ্‌বি তবে ?" এই বলেই চিৎ হয়ে শুয়ে পেটটা খুলে দিলেন, আমরা সকলেই দেখলাম পেটের এক পরদা চামড়ার ভিতর যেন চাবিটা রয়েছে। চাবির আয়তনটা ঠিক ফুটে উঠেছে। আমরা সকলেই সেখানটায় হাত দিয়ে দেখলাম, ঠিক মনে হলো চাবিটা রয়েছে। আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। বেরি তো কাঁদতে আরম্ভ করে দিল, "মা আমাকে বকবেন। ঘরের চাবি না নিয়ে গেলে তালা খুল্‌তে পারবেন না। আপনি আমার চাবি বার করে দিন," বলে খুব দৌরাত্ম্য করতে লাগল। তিনি গম্ভীর ভাবে আমাদিগকে সাক্ষী মানতে লাগলেন, বল্লেন,—"দেখ গো, আমি খেয়ে ফেলেছি, এখন কেমন করে ওকে দেব ? পেটের ভিতরকার জিনিষ কি বার করা যায় ?" তারপর বল্লেন,—"আমি দিতে পারি, তবে চাবির বদলে আমাকে কি দেবে বল।" তাতে সে বল্‌লে, "কি আর দিব ?" তিনি বল্লেন—"বাঃ, চাবি বার করতে আমার পেটটা যে চিড়ে যাবে, তার ক্ষতিপূরণ কে করবে ?" সে বল্‌লে,—"তা আমি কি জানি ? আমি কি খেতে বলেছিলাম ?" এই রকম নানা প্রকারে তাঁর সঙ্গে বচসা করার পর শেষে বল্‌লে,—"পাঁচটী পয়সা দিব।" বাবা বল্‌লেন,—"আচ্ছা তাই, আমার মেয়ে যখন তালা খুলতে পারবে না বল্‌ছিস, তখন আমি তাতেই রাজি হ'লাম।" এই বলেই পেটের সেই জায়গাটায় হাত দিয়ে টানতেই ফট্‌ করে শব্দ হলো, আর দেখি চাবিটা তাঁর হাতে, কিন্তু পেট চেরার কোনও লক্ষণ দেখলাম না।

আর এক দিন বাইরের ঘরে আমরা অনেকেই তাঁর কাছে বসে আছি। দুপুর বেলা। ঘণ্টা দুই পরে তিনি বল্‌লেন,—"তোমরা সব উঠে যাও।" আমি বল্‌লাম,—"না, এখন আমরা যাব না, আর একটু থেকে আপনার কিছু বাজি দেখে যাব।" তিনি হেসে বল্‌লেন,—"কি দেখ্‌বি? শীঘ্র উঠে যা, বুঝ্‌তে পার্‌ছিস না, কেমন একটা দুর্গন্ধ আসছে।" সত্যই তখন ঘরটাময় একটা যেন মড়া-পোড়ার গন্ধ বিশ্রীভাবে পাওয়া গেল। আমি বল্‌লাম, "আপনি যখন আছেন, তখন আমাদের এ গন্ধে কোনই কষ্ট নাই, এ আপনারই খেলা। আমাদিগকে উঠিয়ে দিবার জন্যই এমন দুর্গন্ধ বার কর্‌ছেন। তাই শুনে তিনি হাসতে লাগ্‌লেন আর আমার মাকে বল্লেন,—"দেখ্‌লে গো, তোমার মেয়ে আমার উপর দোষ চাপাচ্ছে। কোথা থেকে গন্ধ এল, আর দোষ হ'ল আমার। তবে আমারই যখন দোষ হ'ল তখন এই দুর্গন্ধের বদলে একটা সুগন্ধই তোমরা পাও।" এই বলা মাত্রই একটা সুন্দর সুগন্ধে ঘরটা ভরে গেল। সকলে হাসতে লাগল।

আর একদিন--সে দিনও আমরা সকলে বাইরের ঘরে বসে আছি। আমাদের দলের মধ্যে একজন আমাকে বল্লেন,—"বাবাকে বল না আমাদের গোটা কতক ফুল দিতে।" আমি তাঁকে সেই কথা বলায়, তিনি বল্লেন,—"কি ফুল নিবি?" আমি বল্লাম,—"চাঁপাফুল।" তিনি খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লেন,—"দুপুর বেলা চাঁপা গাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে, ফুলগুলা বোঁটা ছাড়ছে না।" এই বলেই কিছুকাল চুপ করে থেকে দাড়িতে হাত

বুলাতে লাগলেন, এমন সময় একটা ফুল তাঁর হাতে এল। সেই ফুলটা আমাকে দিলেন। তারপর যতই দাড়ি ধরে টানেন, ততই ফুল পড়ে, আর সকলকেই এক একটা করে দেন। তারপর ফুল আনা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটী বৌ ফুল পায় নি, সে চুপ করে আছে। এমন সময় উপরোক্ত মেয়েটী বল্লে,—"বাবাকে বল তোমার হাতের চাঁপা ফুলটা গোলাপ ফুল করে দিতে।" আমিও তাঁকে তাহা বল্লাম। বলা মাত্রই আমার হাত থেকে ফুলটা চেয়ে নিয়েই যে বউটী ফুল পায়নি তাকে বল্লেন,—"কিগো, তুমি ফুল পাওনি নয়? তোমার ভারি দুঃখ হয়েছে, এই ফুলটা তুমি নাও।" এই বলেই তাকে ফুলটা দিয়ে দিলেন। সে বৌ যে ফুল পায়নি তা আমরা কেহই জানতাম না। পরে তার মুখে শুনলাম তার ভারি কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু কাউকে সে কথা সে পূর্ব্বে জানতে দেয় নি। তাকে ফুলটা দিয়েই তিনি আমাকে বল্লেন,—"অতি লোভে তাঁতি ডোবে। তোমার লোভের শাস্তির স্বরূপ তোমার কাছ থেকে ফুল কেড়ে নিলাম, আর ঐ বৌমাটী ফুল পায়নি—ও কাউকে কিছু বলেনি, চুপ করে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে, কিন্তু অন্তরের ভিতর ভয়ানক ব্যথা পেয়েছে। গাছে আর ফুল নেই, কোথায় পাব, তাই তোর ফুলটী তাকে দিলাম।" ফুলটি অপহরণ হওয়ায় আমার কিন্তু বড় কষ্ট হলো। সভায় এমন ভাবে অপমানিত হওয়ায় অভিমানে আমার প্রাণটা ভরে গেল, চোখ ফেটে আমার কান্না এল, আমি কাউকে কিছু না বলে চুপ করে ঘাড় গুঁজে

বসে থাকলাম। তাই দেখে তিনি সকলকে বল্লেন,--"দেখছো গো, লীলার খুব অভিমান ও রাগ হয়েছে, একটু কিছু সহ্য হয় না, আবার পরের কথায় লাফানও চাই।" তারপর একটু পরে আমাকে ডাকলেন। আমি কিন্তু তাঁর কাছে গেলাম না. তিনি নিজেই আমার হাত ধীরে টেনে নিয়ে নিজের কাছে বসিয়ে, আমার পিঠ চাপড়ে বললেন,—"ভারি অভিমান হয়েছে? আচ্ছা, সন্ধ্যার আগে তোকে একটা এমন জিনিষ দিব যা কেউ কখনও পায় নাই।" তারপরেই আমাদের সভা ভঙ্গ হলো। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি পায়খানা গেলেন। আমার কাজ ছিল তিনি পায়খানা থেকে আসার পর, তাঁর হাতে পায়ে জল ঢেলে দেওয়া, পা ধুইয়ে গামছা দিয়ে চরণ মুছিয়ে দেওয়া। আমি নিজের কাজ কর্চ্ছি, এমন সময় তিনি ডান হাতের মুঠার ভিতর থেকে একটী দ্রব্য আমার হাতে দিলেন, দেখলাম চন্দন মাখা একটী জবা ফুল। আমি বল্লাম,—"এ কি?" তিনি বল্লেন,—"বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পূজার প্রসাদী ফুল, তোর জন্য এনেছি। খুব যত্ন করে তোর কাছে রেখে দিস্. যেন হারিয়ে না যায়, আর কোনও প্রকার অশুচি না হয়। এ ফুলে অনেক মহৎ কার্য্য সাধন হবে। কোনও কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই ফুল একটু গঙ্গাজল দিয়ে একটু বেঁটে খাওয়ালে সে রোগ-মুক্ত হবে।" এই বলে তিনি সন্ধ্যা করতে গেলেন, আমিও বাসায় গিয়ে ফুলটী একটী ন্যাকরায় বেঁধে একটী কৌটার মধ্যে বন্ধ করে, আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দিলাম।

তারপর আর এক দিন সন্ধ্যার আগেই তিনি গুরুরা থেকে এলেন। সন্ধ্যা করতে যাবেন বলে একটা জলচৌকীর উপর দাঁড়িয়ে মুখ হাত ধুচ্ছেন, আমি তাঁর চরণ ধুইয়ে দিচ্ছি। তিনি সেই সময় আমাকে বল্লেন,—"আমি যখন ট্রেনে আসছি, সেই সময় আমি যে গাড়ীতে ছিলাম সেই গাড়ীতেই একটা লোক এক কাঁধি সুন্দর মর্ত্তমান কলা নিয়ে যাচ্ছে। দেখে খুব ইচ্ছা হল, এই রকম কলা কতকগুলা নিয়ে এসে তোদিকে খাওয়াই।" তাই শুনে আমি বল্‌লাম,—"যখন আপনার ইচ্ছা হয়েছে, তখন খাওয়াতেই হবে। আমরা অন্য কোনও ওজর আপত্য শুনব না।" তিনি বল্লেন,—"আচ্ছা, সন্ধ্যা করে উঠে দেখা যাবে, ছাদের উপর আমার বসবার জায়গা করিস্।" এই বলেই তিনি সন্ধ্যা করতে গেলেন। আমি ছাদের উপর তাঁর বসবার জায়গা করতে গেলাম। বৈশাখ মাস, জ্যোৎস্না রাত্রি, ছাদটা বেশ করে ধুয়ে এক খানা ক্যাম্পখাট পেতে দেওয়া হলো মেয়েদের বস্‌বার জন্য একখানা সতরঞ্চ পাতা হলো। অনেক স্ত্রীলোকই জুটেছিলেন। বাবা উঠেই ছাদে গেলেন, আমরা সকলেই তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম, তিনি খাটের উপর শুলেন, আমরা সকলেই নীচে সতরঞ্চির উপর বস্‌লাম। আমার মামা ও রাঁধুনি বামুন সিঁড়ির কাছে বসেছিলেন। এমন সময় বাবা বল্লেন,—"কি রে, কলা খাওয়াতেই হবে!?" আমি বল্লাম,— "নিশ্চয়ই।" তিনি বল্লেন,—"আচ্ছা, তবে সব চুপ করে বসে থাক্, কোনও রকম গোলমাল করিস্ না।" আমরা সকলেই চুপ করে

বসে থাকলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন, তারপর বল্‌লেন,—"কলাগুলো বড্ড মজে গিয়েছে, আনা যাচ্ছে না, সব বোঁটা ছেড়ে যাচ্ছে।" তাই শুনে আমি বল্লাম,—"তা বল্লে হবে না। যেমন করে হউক আনতে হবে।" তিনি আবার খানিকটা চুপ করে থাক্‌লেন। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে উপরের দিকে হস্ত সঞ্চালন করতে লাগলেন। খানিক পরে আমার নাকের কাছে ধরে বল্লেন,—"দেখ্ দেখি কোন রকম গন্ধ পাচ্ছিস্ কি না?" আমি বল্লাম,—"হ্যাঁ সুন্দর পাকা কলার গন্ধ।"আবার সেই রকম উপর দিকে হাত সঞ্চালন করতে লাগলেন। মনে হল উপর দিকে কাকে ডাক্‌ছেন, তারপরেই আমার গায়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর বল্লেন,—"বোঁটা ছেড়ে গেল, কলা এলো না।" আমি বোঁটাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্লাম,—"আমরা কলা চাই, বোঁটা নিয়ে কি কর্‌ব?" আবার সেই রকম হাত করতে লাগলেন। একটু পরেই একটী বোঁটা-ছাড়ান কলা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন,—"এখানে যত লোক আছে কলাটা ছাড়িয়ে একটু একটু করে খেতে দে। এ খুব ভাল জিনিষ। আর এর খোসাটা তুই ভাল করে রেখে দিস্, এও খুব উপকারী জিনিষ।" বলে উপরোক্ত ফুলের বিষয় যা বলেছিলেন, এ খোসার বিষয়ও তাই বল্লেন। আমি কলাটী ছাড়িয়ে সকলকে একটু একটু করে দিলাম, আমার মামা ও বামুনকেও একটু একটু দিলাম, আর খোসাটা যত্ন করে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখলাম। তারপর তিনি অসংখ্য কলা এনে সকলকে খাওয়া-

ইলেন। উপর দিকে এক একবার হস্ত সঞ্চালন করেন, আর সাত আটটী ক'রে কলা সকলের কাছে ছুড়ে ছুড়ে ফেলেন। কলা খেয়ে সকলের পেট ভরে গেল, এমন সুন্দর সুস্বাদু কলা আমি জীবনে আর কখনও খাই নাই। তারপর ছাদের উপর একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল, নীচে বাইরের ঘর থেকে তাঁর শিষ্যরা সকলেই ছুটে উপরে এলেন। গুরুদেব সকলকে ধমকাইয়া তাড়িয়ে দিলেন। তারপরে সেই দিনকার মত সভা ভঙ্গ হল। আমি বাসায় গিয়ে সেই কলার খোসাটীও অতি যত্ন-সহকারে সেই ফুলের সঙ্গে রেখে দিলাম।

বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুদিন পরে কোনও বিশেষ কারণে যখন আমি সেই ফুল ও কলার খোসা বাহির করতে গেলাম, দেখলাম জিনিষই নেই,—কৌটা যেমন তেমনি আছে, ন্যাকরার টুকরাও আছে, কিন্তু ভিতর থেকে জিনিষ দুটীই অদৃশ্য হয়েছে। আমি ত অবাক্ হয়ে গেলাম, ঐ দ্রব্যের এরূপ ভাবে অদৃশ্য হবার কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর কিছুদিন পরে বোঝা গেল যে, কোনও দিন অশুচি অবস্থায় কৌটা ছোঁয়া পড়ায় ঐ দেব-দুর্ল্লভ দ্রব্য অদৃশ্য হয়েছে।

ইহার কিছুদিন পরে আর একদিন ঐ প্রকার আমরা সকলে তাঁর কাছে বসে আছি। নানা রকম গল্প হচ্ছে। এমন সময় তিনি বল্লেন,—"দেখলাম, রাজবাড়ীতে ঝি গুলো পান সাজছে, তোরা খাস তো এনে দিতে পারি।" আমরাও পেয়ে বসলাম। "হাঁ আনুন, আমরা খাব," সকলের মুখে এই কথা

শুনে তিনি বল্লেন,—"যে যত খেতে পারবে তত পাবে, কিন্তু এর মধ্যে কেউ যদি বলে 'খেতে পারব না' তা হলে আর পাবে না, পান আনা বন্ধ হয়ে যাবে।" এই বলেই তিনি খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে দুই হাত উপর দিকে পাতভেই এক আঁজল পান তাঁর হাতে এসে পড়ল, তিনি আমাদের দিকে পান ছুড়ে দিলেন। এই রকম করে বার বার পান দিতে লাগলেন, সকলেই পান খেতে লাগল। রাজবাড়ীর পান সুন্দর সুন্দর, নানা রকম মসলা-দেওয়া লবঙ্গ-মোড়া সুন্দর খিলি, খেতেও অতি সুমিষ্ট, সকলেই খুব পান খেলে। তখন একটী মেয়ে বল্লে,--"বাবা, পান খেয়ে মুখ মেরে গেল, আর খেতে পাচ্ছি না।" অমনি পান আসা বন্ধ হয়ে গেল। অন্য একটী মেয়ে বল্‌ল,—"আমি আরও পান খেতাম, এরই মধ্যে পান বন্ধ করে দিলেন।" সে কথা শুনে তিনি বল্লেন,—"আমি ত' পূর্ব্বেই বলেছিলাম 'কেউ খেতে পারবে না বল্লেই বন্ধ হয়ে যাবে'।" তাতেও সেই বালিকাটী পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন তিনি বল্লেন,—"এখন বল তো একতাল গু এসে তোমাদের্ মাঝখানে পড়বে।" তাই শুনে কেউ বল্লে,— "বাবা, গু আনতে হবে না।" কেউ বল্লে, "আচ্ছা আনুন।" তার কথা শুনে একজন বর্ষীয়সী বল্লেন,—"না বাছা, তা বলিস না, মহাপুরুষের কাছে চন্দন আর বিষ্ঠা দুই সমান। ওঁর কি? তোরা বলবি আর উনি ভাববেন, অমনি সকলের মাঝখানে গু এসে পড়বে। রাত্রি বেলায় সকলকেই নাইতে হবে।"

তখন সেই হুলুস্থুলের ভিতরে সকলে শান্ত হল, আর গুরুদেবও উঠে গেলেন। অন্যান্য সকলে উঠে যে যার বাসায় গেলেন।

আর একদিন গুরুদেব তাঁর কোন শিষ্যার নিকটে কিছু জলযোগ করেছিলেন। তাঁর না কি খাবার ইচ্ছা ছিল না. শিষ্যা তাঁকে জোর করে খাইয়েছিলেন। তারপরেই তিনি আমাদের বাসায় এসে আমাকে বল্লেন,—"এক বালতি জল আন তো, অমুকলোক আমাকে কতকগুলো যা তা খাইয়ে দিলে, আমার কেমন অতৃপ্তি হয়ে গিয়েছে। পেটটা ধুয়ে ফেলতে হবে।" সেই কথা শুনে আমি একটা বড় বালতি করে এক বালতি জল নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে রাখলাম। সেই এক বালতি জল সবটা তিনি খেয়ে ফেল্‌লেন, তারপর সব জলটা তুলে ফেল্‌লেন। তাঁর সেই বড় এক বালতি জল খাওয়া দেখে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। জলটা তুলেই তিনি বল্লেন,—"পেটটা ধুইয়ে ফেলে বাঁচা গেল। পেটটা কেমন গজ্‌গজ্ কর্‌ছিল।"

একবার একদিন আমি আমার বড় ভাইকে সঙ্গে করে গুরুরা গিয়াছিলাম। আমি কোনও বিশেষ কারণে তাঁর নিকট গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময়েই আমি সেখানে পৌঁছে-ছিলাম। বাসায় ঢুকেই দেখি তিনি সন্ধ্যা করতে যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছেন। আমাকে দেখেই বল্লেন,—"এই যে তুই এসে পড়েছিস্, এখনি তোর কথা এদিকে বল্‌ছিলাম।" এই কথা

বলে আমার বস্‌বার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েই সন্ধ্যা কর্‌তে গেলেন। তারপর শুনলাম, তাঁর যে সব শিষ্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে আমার কথা সব বলেছিলেন এবং লীলা এখনই আসবে, সে কথাও বলেছিলেন। আমি কিন্তু সেখানে যাবার পূর্ব্বে তাঁকে কোন সংবাদই দিই নাই। তারপর তিনি উঠে এসে আমার কাছে বস্‌লেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বে আমার বিষয় কিছুই জানাই নি, তথাপি তিনি সেই সব অজানা গোপন বিষয়ে নিজে থেকে আমার সব উত্তর দিলেন এবং আমাকে অভয় দিলেন। পরে আমার শয়নের ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। আমি যে ঘরে শয়ন করেছিলাম, সে ঘরের জানালা কপাট সবই বন্ধ ছিল। আমার ভাইও সেই ঘরেই ছিল, আমরা খুব ঘুমাচ্ছি, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় দেখি তিনি সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে, সমস্ত জানালা খুলে দিচ্ছেন, আর বল্‌ছেন,—"উঃ কি গরম, এত গরমে সব ঘুমাচ্ছে।" তাঁর সাড়া পেয়ে আমরা জেগে উঠলাম। আমি উঠে বসে বল্লাম,—"আপনি সব জানালা খুলে দিচ্ছেন ?" তিনি বল্লেন,—"হাঁ, গরমে তোদের কষ্ট হচ্ছে, তাই জানালা গুলো খুলে দিলাম।" আমাদের খুব গরম লাগছিল বটে, কিন্তু অজানা জায়গা বলে ভয়ে জানালা খুলতে পারিনি। তার-পরেই তিনি বল্লেন,—"আমার বড় পিপাসা পেয়েছে, এক গ্লাস জল খাব।" সেই ঘরেই তাঁর জলের সরাই থাকতো, আর তার কাছেই একটা গ্লাস উপুর-করা ছিল। ঘরে অন্ত

কোনও আলো ছিল না, জ্যোৎস্নার আলো জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর আসছিল। তিনি সেই অবস্থাতেই এক গ্লাস জল ঢেলে নিয়ে খেলেন, কিন্তু জলটা খেয়েই বল্লেন,—"গেলাসে কি ছিল খেয়ে ফেল্লাম। লীলা, উঠ তো।" বলেই বাইরে গেলেন. আমরাও উঠে তাঁর পিছু পিছু গেলাম, তিনি বাইরে গিয়েই তাঁর চাকর সাহানিকে ডেকে বল্লেন,—"এক বালতি জল নিয়ে আয়তো, কি খেয়ে ফেলেছি দেখি।" তাই শুনে সাহানি তাড়াতাড়ি এক বালতি জল এনে তাঁর কাছে রাখলে। সেবারেও তিনি সেই এক বালতি জল খেয়ে ফেল্‌লেন, তারপরেই সেই জল তুলতে লাগলেন। একটু পরেই একটী ছোট সাপ বেড়িয়ে পড়লো। তিনি বল্লেন,—"দেখেছিস্ সাপ খেয়ে ফেলেছিলাম।" আমরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম সাপটা মরে গিয়েছে। কেউটে সাপের বাচ্ছা! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সামান্য একটী চুল কি কুটা গলায় গেলেই ফেলে দিতে হয়, আর তাতে কত উপসর্গ হয়। আর তিনি অবাধে একটা কেউটে সাপের বাচ্ছা খেয়ে ফেল্লেন, একটা বিষাক্ত দ্রব্য খেয়েও তাঁর কোন অনিষ্ট হল না, বরং সাপটাই মরে গেল। মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব হলাহল খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, আর আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবও তাই করেছিলেন।

আমার বাবার কাছে শুনেছিলাম, গুরুদেবের কোন শিষ্য নাকি তাঁর কোনও বন্ধুর কাছে গুরুদেবের গল্প করেছিলেন। কিন্তু বন্ধু বিশ্বাস করতে পারেন নি, তিনি নাকি বলেছিলেন,—

"হাঁ, মানুষে আবার অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।" তাতে শিষ্য বল্লেন,—"নিশ্চয়ই, তুমি গিয়ে দেখে আসতে পার।" সেই কথা শুনে বন্ধু নাকি বলেছিলেন,—"আচ্ছা চল, একদিন দেখে আসা যাক্। তবে আমি এখান থেকে একটা কথা মনে করছি। আমি খুব রসগোল্লা খেতে ভালবাসি, তিনি যদি আমার মনের কথা জানতে পেরে পূর্ব্বেই রসগোল্লা আনিয়ে রেখে, আমি যাবামাত্রেই খেতে দেন, তবেই বুঝব তিনি ক্ষমতাবান্ মহাপুরুষ।" শিষ্য তাতেই রাজি হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গুরুর রওনা হন, এবং মনে মনে বলেন,—"গুরুদেব, দেখবেন আমার যেন লজ্জা নিবারণ হয়।"

এদিকে অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ সমস্ত জানতে পেরে খুব ভাল ভাল বড় বড় রসগোল্লা আনিয়ে তাঁর সামনেই তাকের উপর তুলে রাখেন। তারপর তাঁরা এসে প্রণাম করে বসবা-মাত্রই বল্লেন,—"সব মুখ হাত ধুয়ে জল খাওগে।" বন্ধু ভাবছেন দেখা যাবে, শিষ্য ভাবছেন কি হবে। তাঁরা নিকটেই মুখ হাত ধুয়ে বসতেই গুরুদেব চাকরকে বললেন,—"সামনের তাকে রসগোল্লা আছে, এদের জল খেতে দাও"। বন্ধু তাই শুনেই অবাক্, তারপর খেতে দিলে শিষ্যের খুব আনন্দ হয়েছে, মনে মনে ভাবছেন, লজ্জা-নিবারণ গুরু শিষ্যের লজ্জা নিবারণ করেছেন। এই ভেবে বল্লেন,—"বাবা, বেশ সুন্দর রসগোল্লা তো।" গুরুদেব হেসে বল্লেন,—"হাঁগো, তোমার বন্ধু বাবুটি রসগোল্লা খেতে খুব ভালবাসেন জেনে ফরমাস

দিয়ে আনিয়ে রেখেছিলাম।" বন্ধু আর খাবেন কি, উঠেই তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাতরভাবে বল্লেন,—"অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা কর্ত্তে হবে।" তাই দেখে তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন,—"অপরাধ কিগো, তোমরা দুইজনে এই রকম বলাবলি কর্‌ছিলে, তাই আনিয়ে রেখেছি, যাও জল খাওগে"। তিনি আর জল খাবেন কি, ব্যাকুল হয়ে শিষ্য হবার জন্য কাঁদতে লাগলেন। তারপর নাকি তিনি শিষ্য হয়েছিলেন।

একবার শুনেছিলাম একজন নাস্তিক গুরুরা গিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে তর্ক করেন। তারপর বলেন,—"অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হতে পারে? তা যদি হয় তবে এই লণ্ঠনগুলা ঘরময় চলে বেড়াতে পারে কি? না, ওই জবা গাছে গোলাপ ফুল ধরতে পারে?" তাঁর মুখে সেই কথা শুনে গুরুদেব একটু হেসে বল্লেন,—"হাঁ, ভগবানের রাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। তাঁর ইচ্ছা হলেই লণ্ঠনও চলে বেড়াতে পারে, জবাগাছে গোলাপও ফুটতে পারে।" তাঁর এই কথা শেষ হতে না হতেই সকলে দেখতে পেলেন, লণ্ঠনগুলা ঘরময় চলে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে সকলেই হৈ চৈ করছেন, এমন সময়ে গুরুদেব বল্‌লেন,—"দেখ তো গো, জবাগাছে দুইটা গোলাপ ফুটে রয়েছে না?" তখন সকলেই সেই দিকে গিয়ে দেখ্‌লেন সত্যই একটা জবার ডালে দুইটি গোলাপের ফুল ফুটে রয়েছে। নাস্তিক তখন পরীক্ষা করে দেখছেন যে গোলাপ দুটি কৃত্রিম কি প্রকৃত, কাছে গিয়ে ডালটা ভেঙ্গে দেখলেন যে কৃত্রিম নয়, সত্যই

একটি জবার ডালে জবার পাতার মধ্যে দুইটি গোলাপ ফুটে রয়েছে। তখন তিনিও এসে গুরুদেবের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদা-কাটা করেন। শুনেছিলাম কিছুদিন পরে নাকি তিনিও শিষ্য হয়েছিলেন।

আমরা সকলে সেবার গুরুদেবের সঙ্গে পুরী গিয়েছিলাম। সেই সময় তাঁর মুখে অনেক রকম আশ্চর্য্যজনক গল্প শুনেছিলাম এবং অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করেছিলাম। সে সব উল্লেখযোগ্য নয় বিবেচনায় এখানে আর উল্লেখ কর্‌লাম না। পুরী থেকে ফেরবার সময় ষ্টেসনে এক সাহেব নিভৃতে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়, সেখানে বহুক্ষণ দুইজনের গল্প গুজব হয়। তারপর গুরুদেবের কোনও অলৌকিক বিষয় দেখে সাহেব মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্য হতে চায়, কিন্তু তাকে দীক্ষা দিতে তিনি রাজি হন না।

এই রকম তাঁর অপার আশ্চর্য্যজনক বিষয় দেখে দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। কত ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তিনি আমাদিগের সঙ্গে খেলা করেছেন। আমার বাবার নিকটেও অনেক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার শুনেছিলাম। সকল বিষয় লেখা নিষ্প্রয়োজন। তাই এই খানেই আমি এ বিষয়ের শেষ করলাম। মহাপুরুষের কীর্ত্তি-কলাপ সমাপ্ত করা ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষমতাধীন নয়।

শ্রীলীলাবতী।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু—

কলেকটার, কলিকাতা করপোরেশন।

(৭, কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা)

একদিন শ্রদ্ধেয় গিরীন্দ্র দাদা (রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বলিলেন যে তাঁহার বাটীতে একটী ভদ্রলোক আসিবেন, আসিলে আমাকে খবর দিবেন। খবর পাইয়া প্রকাশ (শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ) ও আমি প্রত্যেকে দুইটী করিয়া বড় গাঁদা ফুল লইয়া গিরীন্ দাদার বাটীতে যাই এবং গেরুয়া-পরা ব্যাঘ্রচর্ম্মাসীন একটী মহাত্মাকে দেখিতে পাই। আমরা উভয়ে (প্রকাশ ও আমি) প্রত্যেকে দুইটি ফুল দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি কেবল আমাদের দিকে মধ্যে মধ্যে চাহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ তথায় থাকিয়া যখন আমরা উঠিতে চাহিলাম, তখন দুইটি গাঁদা ফুল তুলিয়া তাহার দিকে কেবল মাত্র চাহিয়া ফুল দুইটি আমাদিগকে দিলেন। মহাপুরুষের ক্ষণমাত্র-দৃষ্টি নিক্ষেপে আমার গাঁদা ফুল হইতে তীব্র খসের গন্ধ ও প্রকাশের ফুল হইতে অতি মনোহর গোলাপের গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। এইরূপ হওয়ায় প্রথমে মনে হইয়াছিল বোধ হয় আমরা hypnotised হইয়াছি, কিন্তু আমরা বাটীতে চলিয়া আসার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত এই দুইটি ফুলে উক্ত দুই রকম গন্ধ ছিল। আমার দুই ভ্রাতা, আমার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পরিবারস্থ স্ত্রী লোকেরা, যাঁহারা এই সব কথা কিছুই জানিতেন না, তাঁহারা আমার ফুলে

খসখসের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না। গাঁদা ফুলে খসখসের গন্ধ অনুভব করিয়া সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন। যতক্ষণ ফুলটি আমার পকেটে ছিল, বাহিরের লোকেরা—যাঁহারা আমাদের বাটিতে কোনরূপ কর্ম্মসূত্রে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও—সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে এত সুন্দর খসখসের গন্ধ আসিতেছে?" আমরা এই সব দেখিয়া ভক্তিভরে মহাপুরুষকে মনে মনে প্রণাম করিলাম, এবং hypnotised হওয়ার সন্দেহ করিবার দরুণ মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

যে দিন এই ঘটনা হয়, সেই দিনই আমি তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করি এবং তৎক্ষণাৎ তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করিয়া দীক্ষার দিন ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

দীক্ষার পর তাঁহার প্রতি আমি ক্রমেই অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলাম এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যাইবার অবসর খুঁজিতাম। ক্রমে তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে আনিতে এবং অবাস্থতির জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। এ প্রার্থনাও তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই।

প্রথম প্রথম আমরা শুধু নিকট হইতে গন্ধ পাইতাম, কিন্তু পরে আমরা তাঁহার যে সকল বিভূতি দেখিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম।

এক দিন যখন তিনি অন্যমনস্ক-ভাবে মাথা নাড়িতেছিলেন, তখন আমরা ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিলাম। শুনিয়া তাঁহাকে উহার

কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে তাঁহার মস্তকের সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ কপালের অভ্যন্তরে শিলা আছেন, তাহাই তিনি পূজা করেন। আমরা দেখিতে চাহিলে তিনি দেখাইতে সম্মত হইয়া বলিলেন,—“কল্য সকালে আহ্নিকের পর যখন ঘর হইতে বাহির হইব, তখন দেখিও।” পরদিন প্রাতে আমরা সকলে, তিনি আমাদের বাটীর যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় বসিয়া রহিলাম। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,--“সকলে সকালবেলা এক জায়গায় জমা হইয়াছ কেন?” আমরা প্রণাম করিয়া তাঁহার কপালের ভিতরের শিলা দেখিবার প্রার্থনা জানাইলাম। ইহা শুনিয়া, আমরা মুখে মাছি বসিলে তাহাকে তাড়াইবার জন্য যেরূপে হস্ত সঞ্চালন করি তিনি কেবল একবার সেইরূপ করিয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে যেমন হাত রাখিলেন, অমনি দুইটি শিলা মুখের ভিতর হইতে তাঁহার হস্তে আসিল।

তিনি পূর্ব্বে আমাদের বাটীর যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরের সম্মুখে তিনটি দরজা আছে। ঘর হইতে বাহির হইতে হইলে উক্ত কোন দরজা খুলিয়া বাহির হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। সেই দরজার সম্মুখে বারাণ্ডায় তিনটি জানালা ছিল। দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি এই জানালাগুলির ঠিক উল্টা দিকে; অর্থাৎ জানালাগুলি মধ্যবর্ত্তী উঠানের পূর্ব্বদিকে ও সিঁড়িটি পশ্চিম দিকে। এই সিঁড়ির দরজায় বসিলে ঘরের দরজাগুলি জানালার ভিতর দিয়া সম্পুর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যহই

সকালে এই সিঁড়ির দরজায় বসিয়া থাকিতাম এবং দরজা খুলিলেই উপরে গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পিছু পিছু স্নান-জল লইয়া নামিয়া আসিতাম।

একদিন প্রকাশ ও আমি দুইজনে ঐ সিঁড়ির দরজার উপর বসিয়া আছি। দুজনে বসিলে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কেহ দরজা দিয়া বাহির হইতে পারে না, বাহির হইতে হইলে আমাদের উপর দিয়া তাহাকে যাইতে হইবে। অনেক বেলা হইল, তথাপি দরজা খোলা দেখিলাম না। 'আজ এখনও গুরুদেব দরজা খুলিলেন না কেন,' আমরা এইরূপ বলাবলি করিতেছি, এমন সময়ে আমার অগ্রজ, যিনি বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"বাবা নামিয়া আসিলেন, তোমরা সিঁড়িতে বসিয়া কি করিতেছ?" ইহাতে আমরা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম এবং তাড়াতাড়ি গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া স্নান-জল আনিবার জন্য উপরে গিয়া দরজা ঠেলিতে লাগিলাম; দেখিলাম তিনটী দরজাই ভিতর হইতে বন্ধ। ইহাতে অবাক্ হইয়া নামিয়া আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। গুরুদেব বলিলেন,—"দরজা ভাল করিয়া ঠেলিলে দরজা খুলিয়া যাইবে।" ইহাতে পুনরায় আমরা যেমন দরজার নিকট আসিলাম, অমনি আমাদের চক্ষের উপরে মাঝের দরজাটী খুলিয়া গেল, আমাদের ঠেলিতেই হইল না। ঘরের ভিতর হইতে স্নান-জল আনিতে গিয়া দেখি, দুই পাশের দরজায় খিল দেওয়া, ঘরের ভিতর কেহই নাই, অথচ যে দরজা অনেক

চেষ্টা করিয়া আমরা ঠেলিয়া খুলিতে পারি নাই, তাহা আপনা-আপনি খুলিয়া গেল।

একদিন গ্রীষ্মকালে শনিবার দিন অফিসে আসিবার সময় দেখি, যে পাখা চলা সত্ত্বেও গুরুদেবের কোল হইতে ঘাম গড়াইয়া পড়িতেছে। সে দিন আমার পকেটে একখানি নূতন সিল্কের রুমাল ছিল। আমি সেই রুমালে কোলের ঘাম মুছাইয়া দিয়া রুমাল খানা পকেটে রাখিয়াছিলাম। অফিসে আসিয়া কাজ করিতে লাগিলাম। এক ঘরে আমি এবং অপর দুইজন কর্ম্ম-চারী বসিয়া কাজ করিতাম। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহারা সুন্দর গন্ধে বিমোহিত হইলেন, এবং গন্ধের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া তাঁহারা এবং অফিসের অপর কয়েকজন বন্ধু কতকগুলি উৎকৃষ্ট ও সুবাসিত গোলাপ ফুল এবং কতকগুলি গন্ধ-বিহীন ফুল লইয়া আমাদের বাটীতে আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতির পর গুরুদেব গন্ধ-বিহীন ফুলের গুচ্ছটী লইয়া তাহার প্রতি ক্ষণেক চাহিবামাত্র সেই সকল ফুলে সুন্দর গন্ধ হইল এবং গোলাপের গন্ধ কোথায় চলিয়া গেল। গন্ধবিহীন পুষ্প-গুচ্ছের যে দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলেন কেবল সেই দিকেই গন্ধ হইল, অন্য দিকের ফুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় রহিল। যাঁহারা ফুলগুলি আনিয়া ছিলেন, তাঁহারা ফুলগুলি লইয়া গেলেন। যতদিন পর্য্যন্ত ফুলগুলি শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায় নাই ততদিন পর্য্যন্ত ঐ গুলি সেই অবস্থাতেই ছিল।

পূর্ব্বে তিনি প্রতি বৎসরেই বড়দিনের সময় কলিকাতায় আসিতেন এবং প্রথম কয়েক দিন আমাদের বাটীতে থাকিতেন। পরে স্থানান্তরে গমন করিতেন। একবার ঐ সময়ে আসিয়া কয়েকদিন এ বাটীতে অবস্থান করিয়া গুরুভাই শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে গমন করেন। ঐ বাটীতে তিন চারি দিন অবস্থান করিয়া জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে বর্দ্ধমান আশ্রমে গমন করেন। আমি অফিসে যাইবার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—"বোধ হয় হাওড়া ষ্টেষনে যাইয়া প্রণাম করা আমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না।" তাহাতে গুরুদেব বলেন,—"এইত প্রণাম করিলে, আবার ষ্টেষনে যাইবার প্রয়োজন কি?" যাহা হউক, আমি অফিসে যাইয়াই ষ্টেষনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু হাতের কাজ সারিয়া যাইতে একটু বিলম্ব হইয়া গেল। যখন আমি ১০নং প্ল্যাট্‌-ফরমের গেটের নিকট উপস্থিত হইলাম, অমনি ট্রেনটা ছাড়িয়া দিল,—অন্যান্য গুরুভাইরাও দুই এক মিনিটের মধ্যে ১০নং প্লাটফরম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ইহাতে আমার মনে অত্যন্ত হতাশ-ভাব আসিল। বোধ হয় এইরূপ হতাশ-ভাব আমার আর কখনও হয় নাই। কেবলই মনে হইতে লাগিল যে গুরুদেব বলেন যে,—"আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকি", তবে কেন এমন হইল? আমি এত ব্যস্ত হইয়া অফিস হইতে চলিয়া আসিলাম, তিনি কি জানিতে পারিলেন না? ট্রেনটীকে দুই এক মিনিট ধরিয়া রাখিলেই ত আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে

পারিতাম। এইরূপ চিন্তায় মন বড়ই আন্দোলিত হইতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য গাড়ীতে উঠিলাম। যখন হাওড়ার পোলের প্রায় মাঝখানে আসিয়াছি, তখন দেখি নূতন চক্‌চকে সাজে জোতা একটী বড় কুচকুচে কাল ঘোড়া লাফাইতে লাফাইতে কলিকাতার দিক হইতে হাওড়ার দিকে আসিতেছে। আমার গাড়ী-ঘোড়ার বরাবরই সখ ছিল। ঘোড়াটিকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাহার চাল দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে সেই কাল রঙ্গের গাড়ীখানি, আমি যে গাড়ীতে ছিলাম, তাহার পার্শ্বে আসিয়া পড়িল। তখন দেখি অবিকল গুরুদেবের মত একব্যক্তি ঐ গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। আমি ত দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, গুরুদেবের সহিত এত সাদৃশ্যের কোন লোক পূর্ব্বে ত কখন দেখি নাই। যতক্ষণ ঐ চক্‌চকে কাল গাড়ীখানি দেখিতে পাইলাম, ততক্ষণই চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমাদের গাড়ী পোল হইতে নামিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। মাথা গুলাইয়া গেল, সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই কি তিনি আমাকে দেখা দিয়া গেলেন, না, আমি তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম বলিয়াই এরূপ দৃষ্টিভ্রম হইল। মন নানারূপ সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে এক রবিবারে আমরা (অর্থাৎ আমি, গিরীন দা ও অপর ২।১ জন গুরুভাই)

বর্দ্ধমান আশ্রমে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই। তাঁহার প্রসাদ গ্রহণান্তে বেলা প্রায় একটার সময় নানা কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে বলিলাম,—"যে দিন আপনি বিধুবাবুর বাটী হইতে উঠিয়া বর্দ্ধমানে আসেন, সেই দিন আমি যদিও বলিয়াছিলাম যে বোধ হয় আমার ষ্টেষনে যাওয়া ঘটিবে না, তথাপি আমি হাওড়া ষ্টেষনে গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। আমি যেমন ১০নং প্ল্যাটফর্ম্মের গেটে পঁহুছিলাম, অমনি গাড়ীখানি !ছাড়িয়া দিল।" তাহাতে গুরুদেব বলিলেন,--"কেন, তুমি কি আমায় দেখ নাই ?" আমি বলিলাম,—"ট্রেন যে আমি গেটের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ছাড়িয়া দিল।" তখন গুরুদেব বলিলেন,—"আমাকে হাওড়ার পুলের উপর দেখ নাই ?" এই কথা শুনিবামাত্র আমার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং 'হয়ত আমার দৃষ্টি ভ্রম হইয়াছে', এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। কি শুভক্ষণেই বর্দ্ধমান যাত্রা করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। গুরুদেব সেদিন যে কি কৃপা-চক্ষে আমাকে দেখিয়াছিলেন তাহা আর কি বলিব। নিম্নলিখিত ঘটনাটী ইহার পরিচয় দিতেছে।

তিনি প্রথমে গীতার কথা পাড়িলেন, বলিলেন,—"যোগীরা একবার ইচ্ছা করিলে বহু হইয়া প্রত্যেকের নিকট থাকিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপিনীর নিকট থাকিতেন, কিন্তু প্রত্যেক গোপিনী মনে করিতেন যে শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহারই।

নিকট আছেন।” এইরূপ ভাবে কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিলেন,—“আমি ইচ্ছা করিলে এখনই তোমার মত একজন মানুষ সৃজন করিতে পারি, জান?” আমি বলিলাম,—“করেন না কেন?” তাহাতে তিনি বলিলেন,—“তাহার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিবে কে?” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর তিনি বলিলেন,—“বিশ্বাস হইল না?” উত্তর করিলাম,—“বিশ্বাস হইল না বলিলেও প্রত্যবায়, আর বিশ্বাস হইল বলিলেও সম্পূর্ণ ভাবে সত্য কথা বলা হয় না।” ইহার পর তিনি যে বাঘছালের উপর বসিয়াছিলেন তাহা হইতে একটী লোম ছিঁড়িয়া লইলেন, আর পাশে “বসুমতী” কি “বঙ্গবাণী” এই নামের একখানি খবরের কাগজ পড়িয়াছিল, তাহা হইতে একটি কোন্ ছিঁড়িয়া লইয়া দুইটী অঙ্গুলির অগ্রভাগের মধ্যে ধরিয়া রগড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে নানা প্রকারের দ্রব্য তৈয়ার হইতে লাগিল,—যথা লবঙ্গ, এলাইচ, জায়ফল, বেলফুল। খাইবার জিনিষ তৈয়ার হইলেই খাইতে দিলেন, চিবাইয়া খাইলাম। ইহার পর আবার পূর্ব্ব প্রকারে অঙ্গুলির অগ্রভাগ রগড়াইতে রগড়াইতে একটী জিনিষ প্রস্তুত হইল, তিনি বলিলেন,—“মুটো করিয়া ধর।” সে জিনিষটী কি বলিতে পারিলাম না,—কাল রং এবং তরল পদার্থ জমিয়া শক্ত হইবার পূর্ব্বে যেমন একটু থকথকে হয় সেইরূপ। হাত হইতে গড়াইয়া পড়িবার ভয়ে আমি হাত মুটো করিলাম। তাহাতে মনে হইল, গঙ্গার পলি-পড়া মাটী লইয়া মুটো করিলে হাতে যেরূপ বোধ হয় সেইরূপ।

তিনি বলিলেন,—"আমাকে দাও।" আমি তাঁহাকে দিলাম। তারপর কি হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দুইটী ঘুরাইতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণের পর বলিলেন,—"ধর।" এবারেও তিনি আগের বারের মত কিছু দিবেন, এই মনে করিয়া আমি সেই জিনিষটীকেও মুটো করিয়া ধরিলাম, কিন্তু সেবার দেখি একটী জীবন্ত প্রাণী হাতে আসিয়াছে,—একটী নেংটে ইঁদুর। আমি তাহাকে ফেলিয়া দিলে সে ঘরের বাহির হইয়া নর্দ্দমায় প্রবেশ করিল। এই ঘটনায় তখনই আমার মনে হইল যে, যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ইঁদুরের সৃষ্টি হইতে পারে, সেই ইচ্ছাশক্তির প্রখরতায় আমার মত মানুষের সৃষ্টি হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

যখন বণ্ডুলে ৺শিবরাত্রির উৎসব হইত, সেই সময়কার কথা লিখিতেছি। ভবানীপুর হইতে আমরা (আমি, গিরীনদা, প্রকাশ ইত্যাদি) প্রায় প্রতি বৎসরেই উক্ত উৎসব উপলক্ষে বণ্ডুল যাইতাম—কখনও গুরুদেবের সঙ্গে যাইতাম, কখনও বা তাঁহার যাওয়ার পর যাইতাম। একবার গুরুদেব বলিলেন,—"আমি এবার ৺শিবরাত্রির সময় বণ্ডুল যাইব না, তখন আমি গড়বেতায় থাকিব। তোমরা বণ্ডুলে যাইয়া ৺শিবরাত্রির উৎসব ও ব্রতাদি সম্পন্ন করিবে।" আমরা বণ্ডুল যাইলাম। ৺শিবরাত্রির দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ৺শিবপূজার নৈবেদ্যাদি সমস্ত আয়োজন করিয়া ফুল বিল্বপত্র চন্দনাদি ও কোশা কুশি যথাস্থানে সাজাইয়া গাঁজা

সাজিয়া কলিকাতে আগুন রাখিয়া মন্দিরের দুই দিকের দুইটী দরজা, একটি ভিতর হইতে এবং একটি বাহির হইতে, বন্ধ করিয়া দিয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ বারেণ্ডায় বসিয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরে একটি সুগন্ধ (যাহা গুরুদেবের গাত্র হইতে বাহির হয়) আমরা সকলেই পাইলাম, আমরা সকলে তখন বুঝিলাম যে এইবার পূজা আরম্ভ হইবে। বাহির হইতে ঘরের ভিতরে কোশাকুশি নাড়ার শব্দ পাইতে লাগিলাম এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে সদ্য-সাজা গাঁজায় দম দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া দিলে যেরূপ গন্ধ বাহির হয় সেইরূপ গন্ধ পাইলাম। তখন বুঝিলাম পূজা সাঙ্গ হইয়াছে। ঘরের ভিতর যাইয়া দেখা গেল, কোশা-কুশি ফুলের থালা প্রভৃতি যেখানে যাহা রাখা হইয়াছিল, তাহা কোনটা বাঁকাভাবে কোনটা স্থানচ্যুত হইয়া রহিয়াছে।

একবার বগুলে ৺শিব-রাত্রি উপলক্ষে অনেকে আসিলে কিছু আঙ্গুরের প্রয়োজন হয়। গুরুদেব বলিলেন,—"আঙ্গুরের জন্য ভাবনা কিসের? যাওনা ঐ দিকে, দেখিবে কত আঙ্গুর ফলিয়া রহিয়াছে।" যে দিকে দেখিতে বলিলেন, সেদিকে কেবল ভেরেণ্ডা বন। কিন্তু সেই ভেরেণ্ডা বনেই দেখা গেল যথেষ্ট আঙ্গুর ফলিয়া রহিয়াছে। আমরা সকলেই আনন্দের সহিত সেই আঙ্গুর নিয়া আসিলাম।

বগুলে গুরুদেবের কন্যার ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হয়। এই বিবাহোপলক্ষে লোক সংখ্যা যাহা হইবার কথা ছিল তাহা

অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গিরীন্দ্র বাবু এই বিবাহের অনেক বন্দোবস্তের ভার লইয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে নির্দ্ধারিত লোক সংখ্যার প্রায় দশগুণ লোক হইয়াছে, তখন সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। গুরুদেব বলিলেন,—"বিচলিত হইও না। বিচলিত হইবার কিছুই নাই। পাতা করিয়া দাও।" পাতা করা হইল, কতকগুলি পাতে আহার্য্য দ্রব্যাদি দিবার পরই আয়োজন যাহা হইয়াছিল, সব ফুরাইয়া গেল। গুরুদেব বলিলেন,—"আমি ভাণ্ডার গৃহে যাইতেছি, আমার সঙ্গে কেহ আসিও না। আমি চলিয়া আসিলে পর তোমরা ভাণ্ডারে যাইও এবং খাদ্য-সামগ্রী যে-সব পাত্রে রাখা হইয়াছে, সেই সব পাত্রের দিকে না চাহিয়া যে জিনিষের দরকার সেই জিনিষের পাত্রের মধ্যে কেবল হাত দিয়া জিনিষ লইবে।" ইহাতে এত জিনিষ লাগিল যে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তির পরিতোষের সহিত আহারের পরও প্রচুর লুচি, তরকারী, মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী উদ্বৃত্ত হইল। গিরীন্দ্র বাবু তখন বলিলেন,—"আর খাদ্য সামগ্রীর ত কোন প্রয়োজন নাই, মিছামিছি নষ্ট করিয়া কি হইবে?" তখন আবার লুচির কড়া, তরকারীর গামলা ও মিষ্টান্নের পাত্রাদি শূন্য হইয়া গেল। এই অভাবনীয় ঘটনায় সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

একবার বণ্ডুলে গুরুদেবের সহিত অনেক শিষ্য ৺শিবরাত্রি উপলক্ষে আসেন। সেবারে সকলেই ঘোড়ার গাড়ী করিয়া

আসেন। প্রথম গাড়ীতে গুরুদেব ছিলেন এবং পরে তাঁহার শিষ্যেরা আসিতেছিলেন। গাড়ীর ছাদের উপর ময়দার বস্তা, চিনির বস্তা প্রভৃতি অন্যান্য সামগ্রী ছিল। গুরুদেব তখন ঘন-ঘন তামাক খাইতেন। অনেকদূর আসার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং অবিলম্বে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা হইল। তখন সর্ব্বপ্রথম গাড়ীখানি, অর্থাৎ যে গাড়ীতে গুরুদেব ছিলেন সেই গাড়ীখানি, থামিল। তদনুসারে পর পর সব গাড়ীগুলিই থামিয়া গেল। হঠাৎ কেন থামিল, জানিবার জন্য আরোহিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। যখন তাঁহারা গুরুদেবের গাড়ীর নিকট আসিতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন গাড়ী হইতে কেবল ধূম নির্গত হইতেছে,—গুরুদেব আকাশস্থ মেঘ টানিয়া লইয়া মুখ দিয়া ধূমরূপে নির্গত করিয়া দিতেছেন। বলা বাহুল্য, যতক্ষণ বণ্ডুলের পথে গাড়ী ছিল, আদৌ বৃষ্টি হয় নাই। বণ্ডুল আশ্রমে অনেকেই নানারকম দেখিয়াছেন, আমিও অনেক দেখিয়াছি, সব ঘটনা মনে নাই। মহাপুরুষের সকল কার্য্যই অলৌকিক এবং গুরুদেবের এই সকল অলৌকিক ঘটনার ইয়ত্তা নাই। আমি কেবল কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

একদিন বিলাতী বড় ঘরের কয়েকটী ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলা একজন দ্বিভাষী সঙ্গে লইয়া গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পরামর্শে তাঁহারা কলাপাতে আগা গোড়া মুড়িয়া এক ছড়া ফুলের মালা

লইয়া আসেন, মালাটী কলা পাতে এমন ভাবে মোড়া ছিল যে বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। তাঁহারা জুতা খুলিয়া আশ্রমের মেজেতে বসিলে গুরুদেব কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পাতায় মোড়া জিনিষটী কি? চাঁপা ফুলের মালা বুঝি।" সাহেব মেমেরা দ্বিভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাত্মা কি বলিলেন?" দ্বিভাষী বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"What is Champak flower?" দ্বিভাষী বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা বলিলেন,—"আমরা অনেক সময় অনেক কথা এই সব মহাত্মাদের শুনি। কিন্তু আমরা ত সুগন্ধি ছোট সাদা ফুলের মালা আনিয়াছি, তবে মহাত্মা অন্য ফুলের মালার কথা বলিলেন কেন? We have brought a garland of jasmine and why does the Mahatma say differently?" যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, তখন গুরুদেব বলিলেন,—"পাতা-মোড়া মালা ছড়াটি কেন আনা হইয়াছে?" দ্বিভাষী বলিলেন,—"আপনার জন্য ইহা আনা হইয়াছে।" তখন গুরুদেব বলিলেন,—"আমার জন্য যদি আনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে দেওয়া হউক।" তখন মালা বাহির করিবার জন্য কলা পাতের আবরণ খোলা হইল। কলা পাতা খুলিতে খুলিতে মালা ছড়াটির কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়ে। তখন দেখা গেল যে মালার ফুলগুলির রং ও আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিলাতী মেয়েরা অতীব বিস্ময়ের সহিত

বলিয়া উঠিলেন,—"Look, look, the whole thing is changing colour, and the petals are getting elongated." তাঁহারা এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে গুরুদেবের প্রসাদ খাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হন। অতঃপর তাঁহারা কম্বলের আসনে বসিয়া কলা পাতায় বর্দ্ধমানের মিহিদানা খাইয়া গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

বর্দ্ধমানে একবার তিনি ডাক্তার ডাকিয়া তাঁহার কাঁচা কসের দাঁত তুলাইয়াছিলেন। তাহাতে অজস্র রক্তস্রাব হইয়াছিল, উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলী এই অভাবনীয় ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কতকক্ষণ রক্তস্রাবের পর তিনি উঠিয়া গেলেন এবং পরে স্বাভাবিক অবস্থা লইয়া উপর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায়, যেন কিছুই হয় নাই, এইভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। ইহাতে উপস্থিত শিষ্যগণ সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরূপে রক্তমোক্ষণ করিলেন কেন?" উত্তরে তিনি পশ্চিমের একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ পড়িলেন,—"তোমার কয়েকটী শিষ্যের মরণাপন্ন পীড়া; তাঁহাদের প্রাণদান করিতে হইলে তোমার শরীর হইতে রক্ত মোক্ষণ আবশ্যক।"

এই সঙ্গে একটী আধুনিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইল। এক দিন দিবাভাগের দ্বিপ্রহরে গুরুদেব তাঁহার পুত্রকে একখানি নূতন ছুরি দিতে বলিলেন। তাঁহার পুত্র নূতন (কাহারও ব্যবহৃত

নয়) ছুরির পরিবর্ত্তে একখানি ক্ষুর দিলেন। এই ক্ষুর দিয়া তিনি তাঁহার ডান হাতের ভিতর পিঠ খানিকটা চিরিয়া ফেলিলেন এবং কতকটা রক্ত বাহির করিয়া দিলেন। সকলে হতভম্ব হইল। তিনি বলিলেন,—"আজ উদ্ধবের মৃত্যুযোগ ছিল, এরূপ না করিলে উদ্ধবের মাথা হইতে রক্তস্রাব হইয়া মৃত্যু [হইত।" উদ্ধব গুরুদেবের একজন পরম ভক্ত (রায় বাহাদুর উদ্ধব চন্দ্র সিংহ-ঝালদার রাজা)। এই ঘটনার পর সপ্তাহে রবিবার যখন আমি বর্দ্ধমানে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই, তখন তিনি রাজা উদ্ধবের একখানি পত্র পড়িতে দিলেন। এই পত্রের মর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

ঘটনার দিন রাজা মোটার বাইকে পুরুলিয়া হইতে ঝালদায় আসিতেছিলেন। পথের মধ্যে বাইকের ব্রেক বিকল হইয়া যায়। বেলা হওয়ায় বাইক খুব জোরে আসিতেছিল। ব্রেক বিকল হইবার ফলে তিনি গাড়ী হইতে সজোরে দূরে নিক্ষিপ্ত হন এবং তাঁহার মস্তক নিকটস্থ পাহাড়ে সজোরে আহত হয়। ইহাতে তিনি যেমন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভুমিতে পড়িবার মত হইলেন, অমনি গুরুদেব তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। গুরুদেবের ক্ষুর দিয়া হাত চিড়িরার সময় ও তারিখ এবং এই পত্রোল্লিখিত ঘটনার সময় ও তারিখ একই।

একবার তিনি ৺কাশীধাম হইতে বর্দ্ধমানে আসিবার পর আমি তাঁহাকে তথা হইতে ভবানীপুর ৭নং কুণ্ডু রোডে আনিবার জন্য বর্দ্ধমানে যাই। ভূতপূর্ব্ব পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত

গিরীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব সবজজ) মহাশয় গুরুদেবের সহিত ৺কাশী আশ্রম হইতে বর্দ্ধমানে আসেন। গুরুদেব বলিলেন,—"৺কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে বণ্ডুলে গিয়াছিলাম। মায়ের দেহ রাখিতে আর বেশী দিন বাকী নাই। অদ্য তোমার বাটী যাইলে, দিন আঠার তথায় থাকা হইবে।" পরে ভোগের পর তিনি বলিলেন,—"একবার বণ্ডুলে মায়ের খবর লইয়া আসি, তোমরা আহার কর।" এই বলিয়া তিনি আশ্রমের দ্বিতলে গেলেন, আমিও প্রসাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যে স্থানে আহার করিতেছিলাম, তথা হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি দেখা যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি কাপড় পরিয়া ভবানীপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উপর হইতে নামিলেন এবং বলিলেন,—"আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত, তুমি তৈয়ার হও।" আমি তাড়াতাড়ি আহার সমাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বণ্ডুলের খবর কি পাইয়াছেন ?" তাহাতে তিনি বলিলেন,—"বণ্ডুলে গিয়া মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি" (বণ্ডুল বর্দ্ধমান হইতে গাড়ীতে গেলেও প্রায় তিন ঘণ্টার পথ)। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত গিরীন দাদার ও হরগোবিন্দ দাদার পক্ষে ঐ দিন আসিবার কিছু অসুবিধা হওয়ায়, আমি একাকী ভবানীপুরে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ইহার দুইদিন পরে উঁহারা গুরুদেবকে ৭নং কুণ্ডু রোডস্থ বাটীতে লইয়া আসিলেন। তথায় পনর দিন অবস্থানান্তর

তিনি মাতার মৃত্যুর জন্য ভবানীপুরের বাটী হইতে চলিয়া গেলেন তাঁহার চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমাদের বাটীর সকলে আমাকে অফিসে খবর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সকলকেই নিরস্ত করিলেন। সুতরাং তাঁহার গমন সংবাদ আমি পাইলাম না, এবং অফিস হইতে ফিরিয়া যখন সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমাকে খবর দেওয়া হইল না কেন, সকলেই একবাক্যে বলিল, —"গুরুদেব খবর দিতে দিলেন না।" আমি তখন বুঝিলাম, তাঁহার গমনের সময় আমারই মনে রাখা উচিত ছিল এবং আমারই সময় মত বাটীতে উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার চার পাঁচ দিন পরে একদিন রাত্রি এগারটার সময় সংসারিক হিসাব-পত্র দেখা-শুনা করিয়া যেমন আমার পিছন দিকে অবস্থিত তাঁহার ফটোগ্রাফকে প্রণাম করিবার জন্য মুখ ফিরাইলাম, অমনি দেখি গুরুদেব কাছা গলায় দেওয়া অবস্থায় সশরীরে তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, কিন্তু পদ-ধূলি লইবার অগ্রেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

৺পুরীর আশ্রমের কয়েকটী ঘটনা যাহা আমার মনে পড়িতেছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই আশ্রমটি কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। যে বৎসর এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, সে বৎসর আমরা অনেকেই ৺পুরীধামে গিয়াছিলাম। ঐ সময়ে একদিন ক্ষেত্র দাদার হঠাৎ

অত্যন্ত জ্বর হয় এবং তাহাতে তিনি কয়েক দিন ভোগেন। একদিন বৈকালে ক্ষেত্র দাদার জ্বর সম্বন্ধে কথা উঠে। কিন্তু thermometer কাহারও নিকট নাই, কিরূপে জ্বরের তাপমান নির্ণয় হইবে? এইরূপ কথা হইতেছে; এমন সময়ে গুরুদেব অঙ্গুলি দ্বারা একটি জানালা দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখত, ঐ জানালায় একটি thermometer আছে কিনা?" জানালার নিকট যাইবামাত্র সত্যই দেখা গেল বটকৃষ্ণ পালের একটি আধ মিনিটের থারমোমিটর রহিয়াছে। জ্বর দেখা হইল। পরে তিনি বলিলেন,—"যেখান হইতে thermometer পাইয়াছ, আবার তথায় রাখিয়া আসিও।" অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল থারমোমিটর আর নাই। জিজ্ঞাসায় বলিলেন,—"বটকৃষ্ণ পালের আলমারির ভিতর হইতে উহা আসিয়াছিল, পুনরায় তথায় চলিয়া গিয়াছে।"

ঐ বৎসরই একদিন গুরুদেব বলিলেন,—"চল, আজ সমুদ্রে স্নান করা যাক।" আমরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সমুদ্র তীরে যাইলাম। তথায় যাইয়া তিনি বলিলেন,—"সমুদ্র দর্শন এক রকম অনন্ত দর্শন।" বলিয়া জলে অবগাহন করিয়া বলিলেন,—"ডুব দিয়া তোমরা একটু জপ করিয়া লও।" আমরা ডুব দিলাম বটে, কিন্তু উত্তাল তরঙ্গে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। গুরুদেব পিছন ফিরিয়াই বলিলেন,—"কি, দাঁড়াইতে পারিতেছ না?" এই বলিয়া তিনি হস্ত সঞ্চালন দ্বারা একটি গণ্ডী দিলেন—আমরা তাহার মধ্যে দাঁড়া-

ইয়া জপ করিতে লাগিলাম, আসে পাশে চতুর্দ্দিকে উত্তাল তরঙ্গ রাজি ধাবমান, কিন্তু গণ্ডীর ভিতর কিছুই নাই। আমরা যেন একটি নির্ব্বাত নিষ্কম্প পুষ্করিণীর মধ্যে দাঁড়াইয়া জপ করিতে লাগিলাম।

গুরুদেব শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মন্দিরে যাইতাম। কিন্তু অনেক সময় দেখিতাম, যেন তিনি আমাদের অগ্রে চলিতেছেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার গাত্রের স্বাভাবিক সুগন্ধ আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইত।

৺পুরী আশ্রমের চিরস্মরণীয় শ্রেষ্ঠ ঘটনাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশ্রমের দ্বিতলের বারাণ্ডায় একটি তক্তপোষ পাতা থাকে, তাহার উপর কম্বল ও চাদর বিছান থাকে। গুরুদেব ক্রিয়ার পর ত্রিতল হইতে নামিয়া দ্বিতলে আসিয়া উক্ত ৺ক্তপোষে বসেন এবং শিষ্যেরা মেঝের উপর মাদুরে বসেন। একদিন শ্রীগুরুদেবের ক্রিয়ান্তে ত্রিতল হইতে নামিবার পূর্ব্বে দ্বিতলের বারাণ্ডাস্থিত তক্তাপোষের উপর একখানি নূতন চাদর বিছাইয়া দিয়া তাঁহার অবতরণ প্রতীক্ষায় পূর্ব্বোক্ত গিরীন্দ্র দাদা, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায় এবং গুরুদেবের অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত দয়ানিধি দাস দ্বিতল হইতে নিম্নতলে যে সিঁড়ি গিয়াছে, সেই সিঁড়িতে নিম্নদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা গুরুদেবের উপরের ঘরের দরজার খিল খোলার শব্দ শুনিতে পাইলেন। গুরুদেব এইবার ত্রিতল হইতে নামিতেছেন

জানিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য যেমন উঁহারা মুখ ফিরাইয়াছেন, অমনি দেখিতে পাইলেন যে ফরসা চাদরের উপর একটি ছোট শিশুর দুইটী পদ-চিহ্ন পড়িয়াছে এবং তাহার উপর বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় বা তদপেক্ষাও উজ্জ্বল আলোক ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। আশ্রমের একতল হইতে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি এত অপ্রশস্ত যে সিঁড়ির উপরি ভাগে দুইজনে বসিয়া থাকিলে কেহ উপরে উঠিতে পারে না। এই পদচিহ্ন দেখিয়া উপস্থিত সকলে প্রায় আত্মহারা হইবার মত হইয়াছেন, এমন সময় গুরুদেব নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উপস্থিত শিষ্যগণ সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,-"ইহা কি অলৌকিক ব্যাপার?" তাহাতে গুরুদেব বলিলেন,—"ক্রিয়া ও পাঠ শেষ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় অতর্কিত ভাবে আমার মুখে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' এই কথা বাহির হওয়ায় শ্রীশ্রী৺ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া এই পদ্মচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।" জীবনচরিতের প্রথম ভাগে এই পদচিহ্নের উল্লেখ আছে। এই পদ্মচিহ্ন ৭নং কুণ্ডু রোডে অনেকদিন অবস্থিত ছিলেন এবং সম্প্রতি ৺কাশীর আশ্রমে বিশুদ্ধানন্দ কাননে অবস্থিতি করিতেছেন। এই পদচিহ্ন যতদিন পর্য্যন্ত কুণ্ডু রোডে ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা সকলেই ইহাঁর মাহাত্ম্য বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রায় ইষ্টারের সময় গুরুদেব ৺পুরী আশ্রমে যাইতেন এবং শ্রাবণের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া পরে ভবানীপুরে আসিতেন। প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে একবার আমিও

ছুটি লইয়া তাঁহার সঙ্গে ৺পুরীতে ছিলাম। আষাঢ় মাসের প্রায় শেষদিন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি যে সময় সচরাচর কলিকাতায় যান এবারেও কি সেই সময় যাইবেন ?" তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ?" আমি বলিলাম, —"আমার ছুটি ফুরাইতে আর অল্পদিন বাকি আছে, আমাকে তিন চার দিনের মধ্যেই কলিকাতা ফিরিতে হইবে।" গুরুদেব বলিলেন,—"তোমার কি ছুটি পাওনা নাই ?" আমি বলিলাম,—"ছুটি পাওনা আছে বটে, কিন্তু ছুটি লওয়া হয় নাই।" তাহাতে গুরুদেব বলিলেন,—"আর দিন আষ্টেক ছুটির কথা লিখিয়া দাও, তাহা হইলে এক সঙ্গেই যাওয়া যাইবে।" তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমি ছুটির দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইবার জন্য মালীকে ডাকিতেছি, এমন সময় তিনি আবার বলিলেন,—"ডাকে চিঠি দিবার জন্য মালিকে ডাকিতেছ ? চিঠি ছিঁড়িয়া ফেল, আমি আজই যাইব। গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আইস।" জমিদার শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র ঘোষ ও অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায় তখন ৺পুরীতে ছিলেন। আমি তখন চারিটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করিয়া আসিলাম এবং ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় আমরা (অর্থাৎ গুরুদেব, প্রকাশ, কামাখ্যাদাদা ও আমি) Puri Expressএ কলিকাতা ফিরিলাম। পহেলা শ্রাবণ বেলা বারটার সময় পরমারাধ্য গুরুদেব বলিলেন,—"কেন যে হঠাৎ চলিয়া আসিলাম, বুঝিতে পেরেছ ?" আমি বলিলাম,—

"না।" তাহাতে তিনি বলিলেন,—"কল্য এমন সময় জানিতে পারিবে।" পরদিন অর্থাৎ দোসরা শ্রাবণ বেলা বারটার সময় আমার বৈবাহিক (পুত্রের শ্বশুর) ডাঃ যতীশচন্দ্র মুখার্জ্জী আমাদের বাটীতে আসেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, —"গুরুদেব আসিয়াছেন কি ?" আমার মুখে গুরুদেবের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"চলুন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসি।" আমি তখনও আমার বৈবাহিকের আসিবার কারণ কিছুই জানি না। মনে করিলাম তিনি বুঝি কেবল গুরুদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আমার বৈবাহিক বলিলেন, —"একটি শুভ সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আমি ঐ সংবাদটি চিঠি দ্বারা জ্ঞাপন করিতে পারিতাম, কিন্তু আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া নিজেই সংবাদটি আপনাকে দিতে আসিয়াছি। সংবাদটি এই—গতকল্য পহলা শ্রাবণ আমার একটি নাতি হইয়াছে।" গুরুদেব বলিলেন,—"কখন্ হইল ?" তাহাতে আমার বৈবাহিক যে সময় বলিলেন গুরুদেবের সময়ের সহিত সে সময়ের একটু পার্থক্য হইল। গুরুদেব বলিলেন,—"ঘড়ি কি ঠিক সময় দিতেছিল ?" আমার বৈবাহিক বলিলেন,—"ঘড়িটি মিলাইয়া রাখিয়াছিলাম।" তাহাতে গুরুদেব তাঁহার বসিবার ঘর হইতে উঠিয়া গিয়া তাঁহার শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং এক-খানি কাগজ হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"এই নিন আপনার নাতির কোষ্ঠী। এই সন্তান যে দিন গর্ভে

জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দিনই আমি ইহার কোষ্ঠী করিয়া রাখিয়াছি। 'সৌভাগ্যশালী ও মেধাবী'—ইহাই এই সন্তানের কোষ্ঠীর ফল।" পরে আমায় বলিলেন,—"যোগেশ, তুমি যখন সে দিন মালীকে ডাকিতেছিলে তখনই আমার মনে হইল আগামী কল্য পহলা শ্রাবণ বৌমা প্রসব করিবেন। একে বৌমা রোগা, তাহাতে প্রথমবার প্রসব করিবেন, কষ্ট পাইবেন—সেই জন্য চলিয়া আসিলাম। ইচ্ছা হইল, আমি এমন একটা কার্য্য করিব যাহাতে বৌমা প্রসব-বেদনা বিশেষ অনুভব করিবেন না। এ কার্য্য আমি পুরী হইতেও করিতে পারিতাম; কিন্তু যখন কয়েকদিন পরেই কলিকাতাতে আসিব, তখন আর দেরী করিয়া লাভ কি? এই জন্য তোমাকে চিঠি ছিঁড়িতে বলিয়া গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া ত আমার বৈবাহিক মহাশয় অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি নিজে ডাক্তার, তাহাতে দুর্ব্বল মেয়ে, প্রথমবার প্রসব করিবে, যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না পায় তাহার জন্য ডাক্তার ধাইএর বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়া সন্ধ্যার খানিক পরে মা আমার 'পেটটা কেমন করুছে' এই বলিতে বলিতে একটী ঘরের মেঝেয় শুইয়া পড়িল, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল।" এই পুত্রটীই আমার বড় নাতি—ডাক নাম গরু, ভাল নাম শ্রীমান্ জগদীশ চন্দ্র বসু।

একদিন ৺পুরী আশ্রমের বাগানে বালির উপর ছোট একটা সরু লতা পড়িয়াছিল, এই লতাটীর দুই পাশে কয়েকটি

ছোট তরমুজ ধরিয়াছিল। গুরুদেব বলিলেন,—"এই লতাটির একদিকে তরমুজ হইবে এবং অপরদিকে খরমুজা হইবে।" বাস্তবিকই তাহাই হইয়াছিল।

৺পুরী আশ্রমে একদিন সৈনিক বিভাগের একজন বড় কর্ম্মচারী—Captain Hunter, যিনি তখন সেনা বিভাগের কার্য্য লইয়া ৺পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন—গুরুদেবের কথা শুনিয়া একদিন তাঁহার নিকট আসেন এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি সুবিধা পাইলেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিতেন। গুরুদেব সূর্য্যবিজ্ঞানের দ্বারা পদার্থের রূপান্তর করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেন। একদিন কতকটা তুলাকে সূর্য্যবিজ্ঞানের দ্বারা একটি কর্পূরের কেকে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনাটি অপরের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক হইলেও গুরুদেবের পক্ষে অতি তুচ্ছ ঘটনা এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নহে।

একবার আমার ৺পুরীর আশ্রমে অবস্থানকালীন আমেরিকা হইতে দুইটি খ্যাতনামা বিশিষ্ট লোক পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে আসেন। একজনের নাম Sir Thomas Lowell—তিনি একজন আমেরিকার বিজ্ঞানের অধ্যাপক; এবং অপরের নাম Major Brown. তাঁহারা গুরুদেবের নিকট বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টা ছিলেন এবং ইহাতেই এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার ফটোগ্রাফ লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে The Times of India কাগজে একটি প্রবন্ধ বাহির করেন।

৺কাশীর আশ্রমে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা তথাকার গুরুভাইয়েরা অনেকেই অবগত আছেন। এত আশ্চর্য্য ঘটনা বোধ হয় আর কোন স্থানে ঘটে নাই। একদিন ৺কাশীধামের হনুমান ঘাটস্থ আশ্রমে গুরুদেবের নিকটে একটী 'প্লানচেট' লইয়া কয়েকটী গুরুভাই প্রশ্ন গণনা সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করায় গুরুদেব বলেন,—"প্রশ্নগণনা কাহাকে বলে, দেখিবে ?" এই বলিয়া তিনি কয়েকজনকে অন্য একটী ঘরে যাইয়া প্রশ্ন লিখিতে বলেন। আমরা ৫।৬ জন একটী সাদা চিঠির কাগজে আমাদের প্রত্যেকে দুইটী করিয়া প্রশ্ন লিখিয়া কাগজটী মুড়িয়া যত ছোট করিতে পারা যায় ছোট করিয়া গুরুদেব যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে আসিলাম। গুরুদেব ভিক্ষু বাবুকে বলিলেন,—"একটি ছোট খুড়িতে চারি খানি টিকা ধরাইয়া লইয়া আইস।" ভিক্ষু বাবু তাহা করিলে গুরুদেব বলিলেন,—"দুইখানি টিকা খুড়ি হইতে তুলিয়া লও।" টিকা তুলিয়া লওয়া হইল। পরে ঐ দুইখানি জ্বলন্ত টিকার উপর সেই কাগজের টুকরাটি রাখা হইল এবং তাহার উপর আর দুইখানি জ্বলন্ত টিকা চাপা দেওয়া হইল। তারপর গুরুদেব বলিলেন,—"তোমাদের প্রশ্নগুলি জ্ঞানগঞ্জে চলিয়া গিয়াছে।" বেলা ১১টা বা ১২টার সময় আমাদের প্রশ্নযুক্ত কাগজখানি আগুনে চাপা দেওয়া হইল, এবং তিন ঘণ্টা পরে গুরুদেব বলিলেন,—"জ্ঞানগঞ্জ হইতে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আসিয়াছে।" এই বলিয়া তুলট কাগজে লাল কালিতে লেখা আমা-

দের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া প্রশ্ন ও তাহার উত্তর আমাদিগকে দিলেন। ভিক্ষু বাবুর একটি প্রশ্ন ছিল,—"রাখালের শত্রু কবে নিপাত হইবে ?" এই প্রশ্নটি উক্ত কাগজে লিখিয়া উত্তর আসিয়াছিল—"ভিক্ষু এরূপ হিংসাবৃত্তিযুক্ত প্রশ্ন না করিয়া যদি ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব প্রার্থনা করিত তাহা হইলে সে তাহাই পাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া সে এরূপ প্রশ্ন করিল কেন ? ইহাতে ভিক্ষুর যাহা কিছু পুণ্য-সঞ্চয় হইয়াছিল তাহার ক্ষয় হইল।"

উক্ত পুরাতন আশ্রমের অপর একদিনের ঘটনা এই :— একদিন সকালে বেলা ৯টা আন্দাজ ভিক্ষু বাবু ও দাশু বাবু (একটি স্থানীয় ভদ্রলোক) দুইটি বড় ফুলকপি বাজার হইতে কিনিয়া আশ্রমে আসিতেছিলেন। আশ্রমের ত্রিতল গৃহে; গুরুদেব থাকিতেন। যে বড় রাস্তা হইতে আশ্রমের গলিতে প্রবেশ করিতে হয়, তথা হইতে উহা দেখা যায়। গলির ভিতর আশ্রমের সম্মুখস্থ একটি বাটিতে কয়েকটি তৈলঙ্গী স্ত্রীলোক বাস করিতেন। ভিক্ষু বাবু ও দাশু বাবু গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র শুনিতে পাইলেন যে তৈলঙ্গী স্ত্রীলোকেরা বলিতেছে,—"সাধু বাবাকা ক্যা তাজ্জব, সাধু বাবাকা ক্যা তাজ্জব।" ইহা শুনিবা মাত্র তাঁহারা উভয়ে আশ্রমের ত্রিতল গৃহের ছাদের উপর চাহিয়া দেখেন যে ছাদের উপর একটি ছোট মেঘ আসিয়া নামিতেছে। তাহার পর তাঁহারা দেখিলেন যে অন্তরাল হইতে গুরুদেব ছাদে নামিলেন এবং দীর্ঘাকার ধারণ করিয়া আশ্রমের কার্ণিশে পা লাগাইয়া ঝুলিয়া ঘরের ঘেঁস ঘেঁস গরাদে

দেওয়া জানালায় মাথা ঠেকাইলেন এবং তাহার পর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ভিক্ষু বাবু ও দাশু বাবু আশ্রমে আসিবামাত্র যাহা দেখিয়াছিলেন, বর্ণনা করেন। গুরুদেব তখন পূজার ঘরের ভিতর হইতে বাহির হয়েন নাই। কিছুক্ষণ পরে তিনি দরজা খুলিয়া ঘরের বাহির হইলে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি ঘরের ভিতর ছিলেন এবং ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন ?" তাহাতে তিনি বলিলেন,—"ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে ?" তাহাতে ভিক্ষু বাবু ও দাশু বাবু যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা বলিতে লাগিলেন। তখন গুরুদেব বলিলেন,—"দেখে ফেলেছ ? আমার আজ বাহির হইতে দেরী হইয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি বলিলেন,—"অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি আশ্রমস্থ ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রথমে গিয়াছিলাম "ঝালদা", তৎপরে বর্দ্ধমান আশ্রম, তৎপরে খিদিরপুর, এবং তথা হইতে ভবানীপুরে যোগেশদের বাটী হইয়া আবার ৺কাশী ফিরিয়া আসি"। এই ঘটনা ৺শারদীয়া পূজার কয়েক দিবস পরে ঘটিয়াছিল। ৺পূজার ছুটির সহিত কয়েকদিন ছুটি লইয়া আমরা তখন ৺কাশীতে ছিলাম।

আমাদের ভবানীপুরের সম্মুখের দ্বিতলের ঘরগুলি তখন গুরুদেবের বাসের জন্য নির্ম্মিত হইতেছিল, বড়দিনের সময় তাঁহাকে ঐ ঘরগুলিতে থাকিবার জন্য আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম। প্রায় পনর দিন পূর্ব্বে যখন আমি কলিকাতা হইতে ৺কাশী যাই তখন দেখিয়া আসিয়াছিলাম যে আমার কণ্ট্রাক্টর ঘরে কড়ি তুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। কিন্তু পনর দিন পরে,

যে দিন উক্ত ঘটনা ঘটে সেই দিন, গুরুদেব বলিলেন,—"তুমি আমাকে বড়দিনের সময় নূতন ঘরে থাকিবার কথা বলিতেছ; কিন্তু এখনও যে তোমার ঘরের কড়ি উঠে নাই।" ইহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ৺কাশী হইতে গোমো যাইবে, না ভবানীপুর হইয়া গোমো যাইবে ?" সেই বৎসরই ৺কাশী হইতে আমার গোমো যাইবার কথা ছিল। আমি ভবানীপুর হইয়া গোমো যাইব শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"ভবানীপুরে যাইয়া বাটীর অবস্থা দেখিয়া আমাকে পত্র দিও।" খিদিরপুর সম্বন্ধে গুরুদেব অপর শিষ্য বাবু (এক্ষণে ৺) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকিলকে বলিলেন,—"সতীশ, তোমাদের বাড়ী যাইয়া দেখি যে তোমার স্ত্রী ও ছেলেপুলেরা ৺বিজয়াদশমীর দিন তোমার মাকে প্রণাম করিতে যাইয়া অবধি খিদিরপুরে রহিয়াছে।" সতীশ বাবুর স্ত্রী অধিকাংশ সময়ই তাঁহার পিত্রালয়ে থাকিতেন। উক্ত সময়ে সতীশ বাবুর বাটীর ভাঙ্গাগড়া হইতেছিল। সুতরাং তাঁহাদের খিদিরপুরে থাকার সম্ভাবনা কম ছিল। যাহা হউক, সে দিন সতীশদাদা তাঁহার শ্বশুর বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতা অখিল মিস্ত্রীর লেনে পত্র লেখেন, এবং উত্তরে তিনি লেখেন যে—তাঁহার কন্যা কালী ছেলেপুলে লইয়া বিজয়া দশমীর দিন হইতে খিদিরপুরের বাটীতে আছে এবং ভাল আছে। এই ঘটনার দিনই তিনি ভিক্ষু বাবুকে বলিলেন,—"ঝালদায় উদ্ধবকে পত্র লিখ।" (রাজা উদ্ধবচন্দ্র সিংহ গুরুদেবের শিষ্য।)

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন, ভিক্ষু বাবু লিখিতে লাগিলেন। পত্রের মর্ম্ম—"উদ্ধব, গতবারে যখন আমি ঝালদার আশ্রমে গিয়াছিলাম, তখন আমি তোমাকে ব্যাঘ্র শিকার করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্য সকালে আমি ঝালদায় যাইয়া দেখি, তুমি একটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছ। এখনও তুমি যদি ব্যাঘ্র শিকারে প্রবৃত্ত থাক তাহা হইলে ব্যাঘ্রের হিংসাবৃত্তি কবে লোপ পাইবে? ব্যাঘ্রের হিংসাবৃত্তি লোপ না পাইলে সাধারণ শিষ্যের পক্ষে ঝালদা আশ্রমে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িবে" ইত্যাদি। পত্রের উত্তরে ঝালদার রাজা ব্যাঘ্র শিকার করিতে কি প্রকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া অপরাধের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়াছিলেন।

গুরুদেবের আদেশমত বর্দ্ধমান আশ্রমে তাঁহার শিষ্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে ভিক্ষু বাবু একদিন পত্র লিখিলেন। বীরেন দাদা তখন কতকগুলি ইট প্রস্তুত করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছিলেন এবং বর্দ্ধমানের হলে বসিয়া (যে হলে বসিয়া গুরুদেব ধর্ম্মালোচনা করেন) কতকগুলি লোককে ইট গড়িবার জন্য দাদন দিতেছিলেন। এই সম্বন্ধে অনভিমত প্রকাশ করিয়াই বীরেন দাদাকে পত্র লেখা হয়। বীরেন দাদাও দোষ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন। এ সব পত্রের উত্তর আসিতে ঘটনার দিন হইতে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আমি তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া গোমো যাই। ভবানীপুরে আসিয়া দেখি তখন পর্য্যন্তও আমাদের নূতন ঘরে কড়ি উঠে

নাই। গুরুদেবকে পত্রে সে কথা জ্ঞাপন করিয়া পরে আমি গোমো চলিয়া যাই।

অপর একটী ঘটনা গুরুদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। তাহা এই। পূর্ব্বোক্ত সতীশ দাদার স্ত্রীর (কালী দিদির—উমেশ বাবুর কন্যার) একবার টাইফয়েড্ ফিভার হয়। সতীশ দাদা গুরুদেবের সহিত ৺কাশীতে ছিলেন। একদিন সতীশ দাদা একখানি চিঠি পড়িয়া বলিলেন,—তাঁহার স্ত্রীর কঠিন পীড়া, তাঁহার শ্বশুর তাহাই লিখিয়াছেন ; ডাক্তারেরা বলেন পীড়া অতি গুরুতর এবং শেষ অবধি কি প্রকার দাড়াইবে কিছুই বলা যায় না। তাহাতে গুরুদেব বলেন—"সতীশ, তোমার মন চঞ্চল হয় ত তুমি যাও, কিন্তু আমি যাইবার কোন কারণ দেখি না।" সতীশ বাবু ইহা শুনিয়া আর গেলেন না। তৎপর দিন তাঁহার শ্বশুর টেলিগ্রাম করিলেন—"Kali is seriously ill. Start at once. Otherwise you will miss her." সতীশ দাদা এই টেলিগ্রাম খানিও গুরুদেবকে শুনাইলেন। তাহাতেও তিনি পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন। তৎপরদিন পুনরায় টেলিগ্রাম আসিল—"Kali passed a tal this morning. Doctors pronounced the case positively hopeless. All will be over in an hour. Invoke blessings" সতীশ দাদা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া যখন এই টেলিগ্রাম খানি শুনাইলেন, (এই টেলিগ্রামখানি সকালে আসিয়াছিল) গুরুদেব বলিলেন— "টেলিগ্রামের উত্তর দাও।" ইহাতে নিম্নলিখিত উত্তর দেওয়া

হইয়াছিল—"Father says no anxiety. He will visit the patient tonight. She will get round in a week." এই উত্তর পাইয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন এবং রোগীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারেরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ও বলিলেন যে রোগী এখনও যে কিরূপে বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহা তাঁহাদের বোধাতীত। বলা বাহুল্য, সতীশ দাদার স্ত্রী শীঘ্রই সুস্থ হইতে লাগিলেন। যে দিন এই টেলিগ্রাম গুরুদেব পাঠান সেই দিন রাত্রি ১১টার সময় কালীদিদি,- যিনি সম্পূর্ণ উত্থানশক্তি রহিত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিলেন, তিনি—আশ্চর্য্যশক্তি প্রভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন এবং 'বাবা আসিয়াছেন' বলিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছু অদ্ভুত ঘটনার জন্য বাড়ীর সকলে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখেন গুরুদেবের গাত্রে যেরূপ স্বাভাবিক গন্ধ সেইরূপ গন্ধ কালীদিদির মুখ হইতে বাহির হইতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহার পর কালী দিদি সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে গুরুদেব ৺কাশী হইতে ৭নং কুণ্ডু রোডে আসেন। তখন আমরা দেখি তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সর্ব্ব শরীরে টাইফয়েডের স্ফোটক বাহির হইয়াছে। তাঁহাকে ভোগের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলেন,—"প্রসাদের লোভে ভোগ দিলে যাহা ইচ্ছা তাহা দিয়া ভোগ দিতে পার, কিন্তু আমার সেবার জন্য কেবল মাত্র মিসি দিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিয়া সেই দুগ্ধই যেন আমাকে দেওয়া হয়।" তিনি আরও বলিলেন,—

"আমার শরীরে টাইফয়েড স্ফোটকগুলি এখনও রহিয়াছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় ইহাই আমার খাদ্য।"

যাহা হউক, পরে গুরুদেব সুস্থ হইলে পর আমি একদিন গুরুদেবকে বলিয়াছিলাম,—"আপনি কালী দিদির টাইফয়েড ফিভার টানিয়া লইয়া তাঁহাকে বাঁচাইলেন কেন? মেয়ে ছেলে— তাঁহার জীবন কি এতই মূল্যবান্? তাহাতে তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিলাম। "সতীশের দ্বিতীয় বার স্ত্রীবিয়োগের পর সতীশ গুরুরায় আমার নিকট অত্যন্ত কাতর হইয়া আসিয়া পড়ে এবং সুস্থ হইলে পর যখন পুনরায় দারপরিগ্রহের কথা হয় এবং শ্রীযুক্ত উমেশ বাবুর কন্যা কালিদাসীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব হয় তখন সতীশ তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে অসম্মত হওয়ায়, আমি সতীশকে বলিয়াছিলাম,—'এই মেয়েকে বিবাহ করিলে তোমার স্ত্রীবিয়োগের আশঙ্কা থাকিবে না,' এবং আরও বলিয়াছিলাম,— 'যদি তোমার জীবদ্দশায় তোমার এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ কালীর মত একটী কন্যা সৃষ্টি করিয়া তোমার নিকট পাঠাইব।' আমার আশ্বাস বাণী লইয়া সতীশ কালীকে বিবাহ করে, সুতরাং আমার সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই আমি কালীকে জীবন দান করিলাম।"

এই সকল প্রধান ঘটনা ছাড়িয়া দিলেও সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য তিনি অনেক সময়ে তৈয়ার করিয়া শিষ্যদিগকে খাওয়াইয়াছেন এবং এক পদার্থকে ভিন্ন পদার্থে

পরিণত করিয়া তিনি অনেককে দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বে গুরুদেব মাঘ মাসের প্রথম ভাগে ৺কাশীর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ছয় গোমোয় নয় ধানবাদে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বর্দ্ধমান আশ্রমে আসিতেন এবং কখন কখন ধানবাদ হইতে কয়েকদিন কুমার-ডুবীতে অবস্থান করিয়া তাহার পর বর্দ্ধমান আসিতেন এবং ৺শিব রাত্রির পর বর্দ্ধমান হইতে ৭নং কুণ্ডু রোডে আসিতেন। তাঁহার ধানবাদে অবস্থান কালীন যখন প্রত্যহ সকালে তিনি বেড়াইতে যাইতেন তখন ছোট ছোট ছেলেরা কতকগুলি বড় বড় সাদা পাথর কুড়াইয়া লইয়া খেলা করিত। একদিন ছেলেরা এইরূপে খেলা করিতেছে, এমন সময়ে প্রবোধ দাদার পুত্র গুরুপদকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—"গুরো, মিছরি খাবি ত একটা পাথর নিয়ে আয়।" গুরুপদ ঐরূপ করিলে তিনি সূর্য্য-বিজ্ঞান সাহায্যে ঐ পাথরখানাকে মিছরিতে পরিবর্ত্তিত করি-লেন। এই মিছরি আমি খাইয়াছি ও ধানবাদস্থ অনেক শিষ্য শিষ্যা-রাও খাইয়াছেন। ঐখানে অবস্থান কালীন তিনি ছেলেদের সহিত তাহাদের পাথরগুলিকে মিছরিতে পরিবর্ত্তন করিয়া প্রায় তাহাদের সহিত খেলা করিতেন। একবার ধানবাদে অবস্থান কালীন দুই তিন দিন ধরিয়া অত্যন্ত মেঘলা থাকে। তাহার পর একদিন সূর্য্য উদয় হইলে বেলা প্রায় দুইটার সময় তিনি এইরূপ সাদা পাথর লইয়া সূর্য্যবিজ্ঞান সাহায্যে খেলা করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে একটী পাথর বহুমূল্য হীরকে পরিণত হ'ল। এই হীরাখানি ধানবাদের অনেকে দেখিয়াছেন এবং

কলিকাতার অনেক শিষ্যমণ্ডলী ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন।

একদিন ৭নং কুণ্ডু রোডে এই হীরার কথা লইয়া আন্দোলন হওয়ায় জনৈক শিষ্য বলিলেন,—"এত মুল্যবান্ হীরক রক্ষা করাই উচিত।" গুরুদেবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে তিনি এ খানি রাখিতে চাহেন। গুরুদেব কিছু বলিলেন না। পরদিন সান্ধ্য ভ্রমণের সময় তিনি এই হীরাখানিকে একখানি রুমালের একটী খুঁটে বাঁধিয়া অপর খুঁটে রাস্তার কতকগুলি পাথর বাঁধিয়া সজোরে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। যে শিষ্যটি হীরকখানি রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"হীরকখানি এইরূপে যদি জলেই ফেলিয়া দিলেন তবে কেন তৈয়ার করিয়াছিলেন?" উত্তরে তিনি এই সারগর্ভ উপদেশ দেন—"আমি এই সব তৈয়ার করিয়া তোমাদের দেখাই কেবল ইহাই বুঝাইবার জন্য যে আমি তোমাদের মত বিদ্যা উপার্জ্জন না করিয়াও কেবল সত্যনিষ্ঠ ও ভগবানের উপাসনা করিয়া কি করিতে পারি, আর তোমরা পাঁচ বৎসর হইতে বিদ্যারম্ভ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নানা চেষ্টা সত্ত্বেও কি করিতেছ বা করিতে পার। যিনি নিত্য, শুদ্ধ ও সত্য তাঁহাকে অবলম্বন করিলে মানুষ কি হইতে পারে তাহা আমাতেই দেখ এবং এখনও সময় থাকিতে থাকিতে সাবধান হও এবং অনিত্য সুখ স্বচ্ছন্দে অনাসক্ত হইতে চেষ্টা কর।"

একবার তিনি যখন কুমারডুবীতে ছিলেন, তখন আমি ও গুরুদেবের অপর এক শিষ্য শ্রীমান্ বীরেশ্বর দত্ত তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে কুমারডুবী যাই—সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে প্রণাম

করিয়া আমরা তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলাম। তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে আমাদের সহিত কথা কহিলেন এবং রাত্রি নয়টার পর ঘরে চলিয়া গেলেন। পরদিন সকালে যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন তখন প্রণাম করিতে যাইয়া দেখি, তাঁহার করতল অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং 'যেন পুড়িয়া গিয়াছে। হাত মুঠা হইতেছে না এবং অঙ্গুলি নড়িতেছে না। চামচের সাহায্যে অতি কষ্টে সেদিন তাঁহাকে আহার করাইতে হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—"বিধুর (বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় গুরুদেবের একজন শিষ্য) মধ্যম পুত্র কেষ্ট, কলেরার যাতনায় এবং শরীরের উত্তাপ ও পিপাসায় অতিশয় চীৎকার করিতেছিল, অতএব স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার উত্তাপ টানিয়া লইলাম। তাহা না হইলে কেষ্ট বাঁচিত না।" কুমারডুবী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যখন বিধুর বাটীতে খবর লই, তখন জানিতে পারি উক্ত রাত্রে কেষ্টর বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। এক্ষণে কেষ্ট ভাল আছে।

৭নং কুণ্ডু রোডের কতকগুলি ঘটনা। একদিন 'সচ্ছিদ্র জগৎ' এই কথার পোষকতায় গুরুদেব বলিলেন,—"আমার নিকট উত্তমরূপে stopper কর্ক দেওয়া খালি শিশি এবং ঔষধ পূর্ণ শিশি লইয়া আসিলে দেখাইয়া দিব কেমন করিয়া ঔষধপূর্ণ শিশি হইতে খালি শিশিতে চলিয়া যায়।" গুরুদেবের জনৈক শিষ্য বেঙ্গল কেমিকল ওয়ার্কস হইতে কয়েক শিশি Hypophosphite of lime লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। শিশিগুলি যেমন প্যাক করা ছিল তেমনি রহিল। তিনি কেবলমাত্র

একটী প্যাক করা শিশির উপর একটা তার লাগাইয়া দিলেন এবং তারের অপরাংশ একটী খালি শিশিতে জড়াইয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে Hypophosphite of lime এর সমস্ত লাল অংশ ঐ খালি শিশির মধ্যে আসিল এবং প্যাক খুলিয়া দেখা গেল যে Hypophosphite of lime এর শিশিতে কেবল মাত্র জল রহিয়াছে এবং এই জলের রং ফ্যাকাশে নীল।

একদিন তিনি সূর্য্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সন্দেশ তৈয়ার করিয়া আমাদিগকে খাইতে দিয়াছিলেন। সন্দেশ নিম্নলিখিত প্রকারে তৈয়ার হয়। গুরুদেব একটী শ্বেত পাথরের গেলাসের অভ্যন্তরে ছোট কি-একটী জিনিষ রাখিলেন। এবং তাহার পর একটী টুলের উপর গেলাসটী বসাইয়া, গেলাসের উপর পুরু লাল রংএর একটি কাচ (রেলওয়ে সিগন্যালের ল্যাণ্ঠনে যেরূপ কাচ দেওয়া থাকে সেইরূপ) দিয়া ঢাকা দিলেন। তখনই তাঁহাকে অপর এক শিষ্য তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিলে তিনি আমার ভাইপোকে বলিলেন,—"আমি যাইতেছি। গেলাসের গা তাতিলে, ইহার চতুর্দ্দিকে নীল রংএর কাগজ জড়াইয়া দিবে।" গেলাস তাতিলে যখন আমার ভাইপো ঐ প্রকারে নীল রংএর কাগজ জড়াইবার উপক্রম করিতেছে, তখনই গুরুদেব পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘরের ভিতর গেলাসটী লইয়া আসিয়া মাথার উপরের লাল কাচখানি তুলিয়া লইলেন। দেখা গেল, একটি গেলাস ঝুরো সন্দেশ হইয়াছে।

এই সন্দেশের আস্বাদ সাধারণ অপেক্ষা অনেক ভাল, আমরা সকলে পরিতৃপ্তির সহিত ঐ সন্দেশ খাইয়াছিলাম।

গুরুদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে একবার জনাই হইতে মনোহরা আনান হয়। ভারীরা নীচেই মনোহরার বাঁক লইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি উপর হইতে বলিলাম,—"মনোহরার ওজন ভাল করিয়া দেখিয়া লও।" গুরুদেব মনোহরার চেহেরাও দেখেন নাই। তিনি কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মনো-হরা দেখিতেছ কি রকম?" আমি উত্তর দিলে ক্ষণিকের মধ্যে তিনি দুইটি মনোহরা আনয়ন করিলেন। এই মনোহরা জনাইএর প্রেরিত মনোহরা সন্দেশ অপেক্ষা আকৃতিতে অনেক বড়, বেশী সাদা এবং খাইতে ঢের বেশী সুস্বাদু।

একদিন গুরুদেবের একটী শিষ্য শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বেলা সাড়ে নয়টার সময় গুরুদেবকে প্রণাম করিতে আসিলে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৌমা কেমন আছে?" তাহাতে মণীন্দ্র, যাহার ডাক নাম "নিচু", উত্তর করিল,—"আক্কেল দাঁতের জন্য দুপাটী মেড়ে অত্যন্ত ফুলিয়াছে এবং গলায় কতকগুলি বিড়ির মত হওয়ায় মুখের হাঁ প্রায়ই বুজিয়া গিয়াছে, কোনমতে অতি কষ্টে তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করি-তেছে এবং যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে।' গুরুদেব এই সব শুনিয়া বলিলেন,—"দাঁতের যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা, একটি ডাক্তার ডাকিয়া মেড়েটা চিড়িয়া দিলে কষ্টের উপশম হইবে।" নিচু ও আমি ঐ দিন একত্রে অফিসের দিকে আসিতেছিলাম। নিচুর

বাটী হইয়া ট্রামের রাস্তায় যাইতে হয়। আমি অফিস যাইবার সময় যখন নিচুকে ডাকিতেছি, তখন নিচু বলিল,—"আমার স্ত্রী বড় কষ্ট পাইতেছে। সাড়ে চারিটার সময় আমি অফিস হইতে ফিরিতে পারিব। ইহার মধ্যে যেন আমার স্ত্রীর মেড়ে চিড়িবার জন্য ডাক্তারকে উক্ত সময়ে আসিতে বলা হয়।" এই কথা তাহার ছোট ভাইকে বলিয়া আমার সহিত চলিয়া আসিল। নিচু বাটী ফিরিবার বা ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে যে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

ঐ দিন বেলা তিনটা আন্দাজ ৭নং কুণ্ডু রোডে গুরুদেব তাঁহার বিছানায় শুইয়া রহিয়াছেন এবং এক শিষ্য তাঁহার পদসেবা করিতেছে। সকলেই দেখিতেছেন গুরুদেব ৭নং কুণ্ডু রোডের উপরের হলে শুইয়া আছেন। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যার পর নিচু ও নিচুর স্ত্রী ও ভগিনী মহা উল্লাসে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"বেলা তিনটার আন্দাজ নিচুর স্ত্রীর দাঁতের যন্ত্রণা এত বাড়ে যে তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার শিশু সন্তানকে ঝি-এর কাছে পাঠাইয়া দিয়া নিকটস্থ একটী টেবিলের উপর মস্তক রাখিয়া প্রায় রোদন করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ গুরুদেব তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—'বৌমা, তোমার যে বড়ই কষ্ট হইতেছে, একবার হাঁ করত মা।' নিচুর স্ত্রী বলিলেন,—'হাঁ করতে পাচ্ছিনে যে বাবা ঃ' তখন গুরুদেব তাঁহার উপর পাটীর দাঁতের তলায় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে হাঁ করাইলেন এবং অপর অঙ্গুলি

তাঁহার মেড়ের উপর বুলাইয়া দিলেন। ইহাতে তৎক্ষণাৎ নিচুর স্ত্রীর কষ্ট দূর হইয়া গেল এবং তিনি এত স্বচ্ছন্দ অনুভব করিলেন যে তাঁহার একটু তন্দ্রার মত আসিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল যে গুরুদেবের হাত এঁটো হইয়া গিয়াছে, হাতে জল দিতে হইবে, কিন্তু গুরুদেবকে আর দেখিতে পাইলেন না। অল্পক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। নিচু অফিস হইতে আসিলে পর স্ত্রীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ডাক্তারকেও আর আনিতে হইল না। গলায় যে বিড়ির মত হইয়াছিল, সমস্তই অতি অদ্ভুতরূপে মিলাইয়া গেল।"

আমারও পরিবারস্থ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম। আমার পুত্রের বিবাহের জন্য একটি ভদ্রলোক (আমাদের পুরাতন কুটুম্ব) আমাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন; আমি তাঁহাকে বরাবরই বলি যে, আমি বিবাহের কর্ত্তা নহি। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে আমাদের গুরুদেবের আজ্ঞাধীন। তিনি আদেশ করিলে আপনার কন্যা না দেখিয়াও আমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। ইহা শুনিয়া তিনি গুরুদেবকে ৺পুরীর আশ্রমে পত্র লিখেন এবং উত্তর পাইলে আমাকে বলেন,—"এ বিবাহে তিনি অনুমতি দিয়াছেন।" আমি কিন্তু পত্র পাঠে গুরুদেবের অনুমতি দেওয়া সম্বন্ধে কোন কথাই দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং তাঁহাকে বলিলাম,—"স্পষ্টরূপে তাঁহার আদেশ দেখিতে না পাইলে আমি এ বিবাহে অগ্রসর হইতে

পারিব না। গুরুদেব ৺পুরী হইতে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিলে আপনি তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন এবং তিনি আদেশ করিলে আমি তখনই সম্মতি দিব।" গুরুদেব ফিরিয়া আসিলে পর তিনি তাঁহার সহিত পুনরায় বিবাহ সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি এই কথোপকথনে গুরুদেবের কি অনুমতি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কন্যার পিতা কিন্তু বলিতে লাগিলেন, তিনি স্পষ্টরূপে গুরুদেবের অনুমতি বুঝিয়াছেন। গুরুদেবের কতিপয় শিষ্যদিগকে লইয়া সে দিন কোন স্থানে যাইবার কথা ছিল, আমি সে বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলাম। সুতরাং আমি সে দিনও কন্যার পিতাকে ফিরাইয়া দিলাম। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন এবং এতই ক্ষুণ্ণ হইলেন যে আমার ও তাঁর উভয়ের আত্মীয়ের বাটীতে যাইয়া প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, আমাদের ফিরিয়া আসার পর গুরুদেব বলিলেন,—"বৈবাহিককে কি এমন করিয়াই প্রত্যাখ্যান করিতে হয়?" ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। গুরুদেব নিম্নলিখিতরূপে তাঁহার অনুমতি জ্ঞাপন করেন।

তিনি আমার পুত্রকে বলেন,—"যতীশ, তোমার বিবাহের জন্য একটী ভদ্রলোক অত্যন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, যোগেশের পুত্র যতীশের বিবাহ ডাক্তার মুস্তফীর কন্যার সহিত স্থির হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়াই তিনি বলিলেন,—"অপর কন্যাটি পরমাসুন্দরী।"

তাহাতে আমার পুত্র বলিল,—"বাবা ত আজও মুস্তফী মহাশয়কে ফিরাইয়া দিয়াছেন। যদি একটি সুন্দরী কন্যার কথা জানিতেন, তবে তাঁহার পিতাকে ঐরূপ ভাবে উত্তর দিলেন কেন?" তাহাতে গুরুদেব বলিলেন,—"আমি ডাক্তার মুস্তফীর কন্যাকেও দেখিয়াছি। এ মেয়েটিও বেশ সুন্দরী। তবে অপর মেয়েটীর মত চামড়া অত কটা নহে। কটা চামড়া লইয়া কি করিবে? যাহার অদৃষ্ট সুন্দর, সেই প্রকৃত সুন্দর।" তারপর ডাক্তার মুস্তফীর বাটী কেমন, কিরূপে বাটীতে প্রবেশ করিতে হয়, কোন্ ঘর আমার পুত্রের বাসের ঘর হইবে, ইত্যাদি সমস্ত বিস্তারিতরূপে বলিতে লাগিলেন। ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইহাই মনে হইল যে ডাক্তার মুস্তফী মহাশয় গুরুদেবের অভিপ্রায় ঠিক বুঝিয়াছিলেন, কেবল আমি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বৃথা কষ্ট দিয়াছি। এইরূপ চিন্তায় রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হইল না এবং পরদিন সকালে যখন গুরুদেবকে প্রণাম করিতে যাই, তখন তিনি বলিলেন,—"রাত্রে তোমার ঘুম হয় নাই দেখিতেছি, অফিস যাইবার পূর্ব্বে সতীশ মুস্তফীর বাটীতে যাইয়া বিবাহে সম্মতি জানাইয়া এসো।"

গুরুদেবের আদেশ মত আমি তাহাই করিলাম। ভাবিয়াছিলাম আমি আসিয়াছি শুনিয়া মুস্তফী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, কিন্তু তাহা করেন নাই। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। তিনি সম্পূর্ণ অবিচলিত-

ভাবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আমি বিবাহে সম্মতি জানাইলে তিনি বলিলেন,—"আপনি যে আজ আসিবেন তাহা আমি জানিতাম।" এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময়ে আমার যে আত্মীয়ের বাটী যাইয়া সতীশ বাবু (মুস্তফী মহাশয়) প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া গিয়াছিলেন সেই বাটীর গৃহকর্ত্তা তাঁহার ভগিনীপতি ডাক্তার মুস্তফীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন,—"গতকল্য আপনার বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সতীশ বাবু আমাদের বাটীতে আসিয়া প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। এখন দেখিতেছি আপনি আবার তাঁহার কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহের জন্য ভাবিতেছেন।"

এ:কি অদ্ভুত রহস্য। যাহা হউক, তাহার পর ডাক্তার মুস্তফী বলিলেন,—"আমি বাটীতে ফিরিয়া যাইয়া অতি দুঃখিত অন্তরে স্ত্রীকে বলি,—'ভবানীপুরে বোধ হয় কন্যার বিবাহ হইল না।' তাহাতে আমার স্ত্রী বলেন,—'যদি যোগেশ বাবুর আদেশেই এই বিবাহ হয়, এস আমরা তাঁহার ধ্যান করি।' ঐ রাত্রের ভোরে ডাক্তার মুস্তফীর স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—"দেখ, এইরূপ একজন (গুরুদেবের আকৃতির বর্ণনা করিয়া) আমাকে বলিলেন, 'মা, ডাকিতেছ কেন? এ বিবাহ হইবে এবং যোগেশ তোমাদের বাটীতে এই এল ব'লে'।" ডাক্তার মুস্তফী তাঁহার স্ত্রীর মুখে গুরুদেবের অবিকল বর্ণনা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং নিশ্চিন্তভাবে আমার আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন।

একদিন অফিসে আসিবার সময় ফুটপাথের উপর পা পিছলাইয়া আমি পড়িয়া যাই এবং তাহাতে আমার উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। আমি তাহাতে উত্থান-শক্তি-রহিত হইলে দেখি আমার একজন নিম্নতন কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি অফিসে খবর দেওয়ায় অফিস হইতে অনেক লোক আসিয়া আমাকে অফিসে লইয়া যায় এবং আমার পুত্রকে খবর পাঠায়। আমার পুত্র তাঁহার সহিত দুই জন ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হয়। অফিসে আসিবার পূর্ব্বেই আমার পায়ের হাড় সেট্ করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর এক্স্ রে দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া এম্বুলেন্স গাড়ী আনে। আমি বেলা তিনটার মধ্যে ৭নং কুণ্ডু রোডে আমার শুইবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হই। এই দুর্ঘটনা আমার বাটীতে ঘটিলে বোধ হয় এত শীঘ্র এবং এত সুচারুরূপে এ সব সম্পন্ন হইত না। ইহাতেও আমি আমার উপর গুরুদেবের অভাবনীয় কৃপাই দেখিতে পাই। আমি প্রায় তিন মাস শয্যাগত ছিলাম ; কিন্তু গুরুদেবের দয়ায় এত বিপদেও কোন বিশেষ কষ্ট অনুভব করি নাই। গুরুদেব তখন ৺কাশীতে ছিলেন। তিনি প্রায় প্রতি পত্রেই অসুস্থ অবস্থায় কি কি উপসর্গ হইবে তাহা লিখিতেন এবং সেই উপসর্গ দেখা দিতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন ;—"অমুক দিন হইতে অমুক দিন পর্য্যন্ত যোগেশের অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ হইবে, হইতেছে কিনা লিখিও। অমুক দিন হইতে অমুক দিন পর্য্যন্ত

তাঁহার রাত্রে ঘুম হইবে না, এরূপ হইতেছে কিনা লিখিও” ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সমস্ত উপসর্গগুলি পর্য্যায়ক্রমে দেখা দিয়াছিল। তিনি ৺কাশীতে থাকিলেও আমি প্রত্যহ আমাদের ঘরে তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিতাম। রাসবিহারী নামীয় একটী বালক, যে আমাকে নার্স করিবার জন্য আসিয়াছিল, সে প্রত্যহই ঘরে একটি সুগন্ধ অনুভব করিত। এই ঘটনায় রাসবিহারী, যে আমাকে অল্পদিনের জন্য নার্স করিতে আসিয়াছিল, আমাকে আর ছাড়িতে পারিল না। অবশেষে সে গুরুদেবের নিকট দীক্ষা লইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। দুইজন ডাক্তার আমাকে প্রত্যহই বৈকালে দেখিতে আসিতেন। তাঁহারা বলিতেন,—ছোট ছেলের হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে, তাঁহাদের পুস্তকের লিখন মত হাড় জুড়িতে প্রায় নব্বই দিন লাগে। আমার বয়সে যে কতদিন লাগিবে তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। অন্ততঃ ১৪০ দিন লাগিতে পারে। যাঁহারা আমাকে দেখিতে আসিতেন, ডাক্তারেরা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—হাড় সোজা ভাবে ভাঙ্গিলে, হাড় জুড়িয়া গিয়া আমি চলনক্ষম হইতে পারিতাম, না হয়ত একটু ছোট হইয়া যাইত। কিন্তু বাঁকাভাবে যেরূপে আমার হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহাতে আমাকে আর উঠিতে হইবে না। আমি কিন্তু ডাক্তারদের বলিতাম,—“আপনাদের কেতাবে যাহাই থাকুক না, আমি বোধ হয় ৯০ দিনের পরই চলনক্ষম হইব।” আমি যে কখনও উঠিয়া দাঁড়াইব, একথা ডাক্তারদের বিশ্বাস ছিল না।

কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য এই যে ৯০ দিনের পরই আমি চলনক্ষম হইলাম এবং পাও আমার ছোট হয় নাই। ডাক্তারেরা ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহারা বলিতেন,—"এরূপভাবে পা ভাঙ্গিয়া এই প্রকার আরোগ্য লাভের কথা যদি কেহ Medical Journalএ রিপোর্ট করেন তাহা হইলে তিনি পাগল বলিয়া পরিগণিত হইবেন।"

এই বৎসরের পর বৎসর আমার হারনিয়া নামিয়া যায়। বেলা ৯টার সময় আমার হারনিয়া নামিয়া পড়ে ও বেলা ১২টার সময় অসহ্য যন্ত্রণা এবং বমি আরম্ভ হয়। আমার অজানা ভাবে গুরুদেব অপর ঘরে তাঁহার যন্ত্র লইয়া বসিয়া রহিলেন। ইচ্ছা ছিল একবার সূর্য্য উদয় হইলে তখনই সূর্য্যবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু সেদিন আর সূর্য্যের উদয় হইল না। আমি বেলা প্রায় চারিটার সময় একটি নার্সিং হোমে গমন করি। সেদিন রবিবার, প্রায় ৪০জন শিষ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার এই দুর্ঘটনায় কেহই চলিয়া যাইলেন না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চিন্তিতভাবে সকলেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা সকলেই গুরুদেবকে ৭নং কুণ্ডু রোডে দেখিতেছেন। অথচ আমার হারনিয়া অপারেশনএর সময় গুরুদেব নর্সিং হোমএ রহিয়াছেন। আমার ভাই, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের নর্সিং হোম হইতে ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় সকলেই অতি চিন্তিতভাবে গুরুদেবকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন গুরুদেব জ্ঞানগঞ্জের চিঠি,

যাহা এই ঘটনার বহু পূর্ব্বে আসিয়াছিল, তথা হইতে পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, "উক্তদিনে যোগেশের হার নিয়া নামিবে—বেলা ৯টার পর হইতে ব্যারামের বৃদ্ধি হইবে। সেদিন সূর্য্যোদয় হইবে না। অস্ত্র-চিকিৎসা অবশ্যম্ভাবী। প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই।" ইহা শুনিয়া উপস্থিত শিষ্যবৃন্দ আশ্বস্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাতেই ডাক্তারেরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। পা ভাঙ্গার সময় যে সব ডাক্তারেরা আমাকে দেখিতেন, নর্সিং হোমএ তাঁহারাই আমাকে দেখিতে আসিতেন। অপারেশনের পরের দিন তাঁহারা আমার ব্যাণ্ডেজ খুলিলেন, এবং তাহাতে কোন রূপ রক্ত না দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন,—"আপনার কি সবই অদ্ভুত রকমের? আমরা কেতাবে এমন কোন কোন কথা পড়িয়াছি যাহা আপনার এই অপারেশনেই প্রথম দেখিলাম।" গুরুদেব অশরীরী অবস্থায় আমাকে নর্সিং হোমএ দেখিতে আসিতেন, আমি তাহা বেশ অনুভব করিতে পারিতাম। আমি সুস্থ হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলে নর্সিং হোমএ আমার যে দুইটি বিলাতী নর্স নিযুক্ত ছিল তাহারা আমাকে কিরূপে যত্ন ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করিত সেই সব কথা বলিতেন।

এইখানে একটি আধুনিক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। গত ১১ই কার্ত্তিক (১৩৩৬), সোমবার, আমি আফিস হইতে বাড়ী যাইবার সময় ট্রামে করিয়া বাটী যাই। আমি সাধারণতঃ ট্রামে কখন যাতায়াত করি না। বিশেষতঃ পা ভাঙ্গার পর মোটেই ট্রামে

চড়ি না। কিন্তু সে দিন কি গ্রহবশতঃ ট্রামে চড়িয়া ছিলাম বলিতে পারি না। আমি যখন ট্রাম হইতে নামিলাম, তখনই একখানি বাস আমার একেবারে পিছনে আসিয়া পড়িল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ট্রাম গাড়ী ও বাস্‌এর মধ্যে যে অপ্রশস্ত সামান্য জায়গা ছিল, পাশ কাটিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং ২য় শ্রেণী ট্রামের হাতল ধরিয়া ফেলিলাম। কিন্তু ট্রাম তখন চলিতেছিল, সুতরাং হাতল ধরিয়া ২।৪ মিনিট পর আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, হাতল হইতে হাত খুলিয়া গেল। ইহাতে আমি হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গিয়া বিশেষরূপে আহত হইতাম। গুরুদেব তখন ৺কাশীতে রহিয়াছেন, কিন্তু কি তাঁহার মহিমা এবং অভাবনীয় কৃপা যে সেই মহাসঙ্কটের মুহূর্ত্তে তিনি আমার শরীরে বল সঞ্চার করিয়াছিলেন। আমি পড়িয়া গেলাম না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম।

৺কাশীর শিষ্যগণ উক্তদিন গুরুদেবের একটু ব্যস্তভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি আমার কোন পত্র আসিয়াছে কি না পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যেরা একটু চিন্তিত হইয়া আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"অদ্য যোগেশের মৃত্যু-যোগ ছিল।"

কামাখ্যা দেবী দর্শন করিতে যে বৎসর যাওয়া হয়, সে বৎসর আমাদের যাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্বে আশ্রমের সম্মুখস্থ দোকানে গুরুদেবের ৺কামাখ্যা যাওয়া সম্বন্ধে কথা হইতেছিল,

এবং পরস্পর বলাবলি হইতেছিল যে কামাখ্যায় অত্যন্ত মশা এবং মশাগুলি অস্বাভাবিক বড়। এই সব কথা রূপ-নারায়ণ নন্দনস্থ আশ্রমের ঘর হইতে শুনা যাইতেছিল। আমার একটী ছোট নাতনি এই কথা শুনিয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কামিখ্যার মশা কি রকম?" গুরুদেব আমার নাতনিকে বলিলেন,—"টুনু, কামিখ্যার মশা দেখবি?" ইহা যেমন বলা, অমনি তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগে একটী চামচিকা ঝুলিতে লাগিল। এই চামচিকাটিকে তিনি রৌদ্রে রাখিয়া দিলেন, চামচিকা উড়িয়া চলিয়া গেল।

একদিন তিনি উক্ত আশ্রমে নিজের নাভিমূল স্ফীত করিয়া নাভিপদ্ম দেখাইয়াছিলেন। নাভিমূল যখন স্ফীত করেন তখন এক মনোবিমোহনকারী গন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত হইয়া গিয়াছিল। এই পদ্মের কথা বর্ণনায় আনা যায় না। ইহা রূপক নহে, বাস্তবিকই সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায়। যতই নাভি স্ফীত করিতে লাগিলেন, পদ্ম ততই প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।

আর একদিন শ্রীমান্ কেদারনাথ ভৌমিক নামক গুরু-দেবের জনৈক শিষ্য, এক ছড়া বেলফুলের মালা লইয়া আসেন। গুরুদেব বলিলেন,—"এই বেল ফুলের মালা ছড়াটী বহু-মূল্য মুক্তার মালায় পরিণত হইতে পারে।" এই বলিয়া তিনি একটি বেলফুল লইয়া উহাকে বায়বিক বিজ্ঞানের সাহায্যে অতি উজ্জ্বল, সুন্দর ও সুগোল মুক্তায় পরিণত করিলেন। আমাদের সম্মুখে বেলফুল আস্তে আস্তে মুক্তায় পরিণত হইল। মুক্তা

জমিয়া শক্ত হইবার পূর্ব্বে একজন মুক্তা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাতে মুক্তায় একটু গাঁটের মত হয়। গুরুদেব বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই মুক্তার ছালটী তুলিয়া লইলেন। মুক্তা আকৃতিতে একটু ছোট হইল বটে—যদিও এই আকৃতি সাধারণ মুক্তার আকৃতির অপেক্ষা অনেক বড়—কিন্তু অতি উজ্জ্বল ও সুডোল হইল। আমার পুত্র এখনও এই মুক্তা ধারণ করিতেছে। আমি, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ননীলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় এখনও এই মুক্তার ছাল মাদুলিতে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এডভোকেট, হাইকোর্ট, কলিকাতা।

(১৫।২ রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা)

(১) দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, খিদিরপুরবাসী হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গোলাপ ফুলের গন্ধ আকর্ষণ ও ঐ সঙ্গে ঐ ফুলের পত্রগুলি ঝড়িয়া পড়া।

(২) বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি এখন ৺কাশী-ধামে ১০০নং সূর্য্যকুণ্ডুতে বাস করিতেছেন তাঁহার অনুরোধে গৃহ মধ্যে ফুলের গন্ধ ইচ্ছাশক্তিতে আনয়ন ও পুষ্প আনয়ন।

(৩) মস্তকের মধ্যে মাথার খুলির নিচে ৬টি ঠাকুর রক্ষা করা, ১টি শালগ্রাম শিলা, ২টি লম্বা, লাল ও শ্বেত আভাযুক্ত শিবলিঙ্গ ও তিনটি উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি শিবলিঙ্গ। মাথা নাড়িলে ঐ গুলির খট খট শব্দ মাথার মধ্যে শুনিতাম। আমি নিজ হস্তে মাথা দুলাইয়াও ঐরূপ শব্দ পাইতাম। সাধারণতঃ প্রাতে পূজার সময় মুখ হইতে জিভ কিঞ্চিৎ বাহির করিয়া বাবা মুখ-গহ্বর হইতে ঠাকুরগুলি বাহির করিতেন দেখিতাম।

আমাদের পরিচিত খিদিরপুর মুন্সীগঞ্জের অধিবাসী ৺যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ নাকের একদিকের ছিদ্রে তুলা গুঁজিতেন বলিয়া সাধারণতঃ "তুলা-ঘোষ" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি

একদিন আমার সাক্ষাতে তাঁহার মনের কথা ও তাঁহার বিষয় বলিতে পারেন কি না বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং বলিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন। তাহাতে বাবা তাঁহার গুহ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া কদর্য্য স্বভাবের পরিচয় যেরূপভাবে বিবৃত করিলেন তাহাতে যোগীন বাবু বিশেষ বিচলিত হইয়া একেবারে তাঁহার চরণ ধরিয়া অনুতপ্তভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উক্ত স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কোষ্ঠী দেখিয়া খিদিরপুরের কৃষ্ণধন আচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী-স্থানে দোষ আছে। তাঁহার পত্নী বাঁচিবে না, এবং পুত্র-স্থানেও দোষ আছে—পুত্র জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার অল্প বয়সে দুই স্ত্রী বিয়োগের পর পিতামাতা যখন পুনরায় বিবাহের জেদ করেন তিনি প্রথমে সম্মত হন নাই। পরে গুষ্করায় গুরুদেবের নিকট যাইয়া বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার অবস্থার কথা বলেন। বাবা তখন বলেন,—"তোমার কোষ্ঠীর ফল বদলাইয়া দিব। তোমার এই স্ত্রী তোমার জীবদ্দশায় মরিবে না-- ইহাকে তুমি বিবাহ কর।" ১৩১২ সালে তিনি এই বিবাহ করেন। সেই পত্নী এখনও জীবিতা—তাঁহার ৩টি পুত্র ও ১টি কন্যা হইয়াছে।

এই সব উপলক্ষ্যে বাবা বলিতেন,—"তোরা দেখিতেছি কিছুই জানিস না। বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়াছিস অথচ আমাদের শাস্ত্রের বা যোগের কোন বিষয়েই চর্চ্চা করা হয় নাই। যাহা কিছু কেহ আমার নিকট শোনে বা দেখে তাহাতেই

অবাক্ হইয়া যায়।” আরও বলিতেন,—“আমার উদ্দেশ্য যে কিরূপে গৃহী গৃহে থাকিয়া যোগসিদ্ধ হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিব। কিন্তু কার্য্য করা চাই, খাটা চাই। কেবলমাত্র পড়ায় বা কথায় চলিবে না। ঘর সংসার ছাড়িয়া বনে যোগ-সাধনায় অনেক কষ্ট ও বিঘ্ন আছে।” বাবা আর মাকে কষ্ট দিয়া, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া, বনে যাওয়া তাঁহার মতে ঠিক নহে। বনমধ্যে প্রথম অবস্থায় প্রাণ রক্ষার জন্য ও খাইবার অভাবে বিশেষ বিপদ ও কষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারে সে সব চিন্তা নূতন করিয়া করিতে হয় না। কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যায় একটু সময় করিয়া যোগ-সাধনা করিলে সিদ্ধ হওয়া যায়। এই-রূপে সাধনার প্রার্থী হইয়া আমি বাবার নিকট দীক্ষা লই। সাধনা-সিদ্ধ হইলে যোগ বিভূতি স্বতইঃ বিকশিত হয়। সূক্ষ্মদৃষ্টি, সুদূরশ্রবণ ও ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত বলবতী হয় ও অন্যের মনের ভাব চিন্তা করিলেই নিজের আয়ত্ত হয় ও বলা যায়। এই সব বিভূতির স্ফুরণ আমি অনেকবার অনেক জায়গায় দেখিয়াছি। বাবা বলেন,—এরূপ দেখাইবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে এই সব দেখিলে লোকের যোগ-সাধনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবে। কিন্তু লোকে এখন এসব তামাসা দেখিবার মত দেখে এবং অন্য লোককে ডাকিয়া তাঁহাকে বারবার এসব তামাসা দেখাইতে বলে নিজেরা যাহাতে যোগাভ্যাস করিতে পারে ও বিভূতি সম্পন্ন হয় তাহার কোনও ব্যবস্থা করে না।

বাঙ্গালা ১৩২১ সালের ৺পূজার অবকাশে আমরা একদল আলীগড় হইয়া হরিদ্বার ভ্রমণে বাহির হই। কানপুরে

বিশ্রাম করিয়া আহারাদির পর গাড়ীতে উঠি। একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বাবার সহিত শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (একজন অবসর-প্রাপ্ত সবজজ, বাড়ি বাঁকুড়ায়, তেলিপাড়া গ্রামে), হাইকোর্টের উকিল ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের খোসবাগের জমিদার ইন্দুভূষণ দত্ত ও আমি ছিলাম। তখন মধ্যাহ্নে গাড়ীতে বেশ গরম অনুভূত হইল। বাবা নিজের বাম হস্তের কনুয়ের পার্শ্বদেশ মর্দ্দন করিয়া সরিষা প্রমাণ ময়লা তুলিতে তুলিতে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—"এইটা কি দেখিতেছ বল ?" আমি বলিলাম,—"উহা আপনার গাত্রের সরিষা প্রমাণ ময়লা মাত্র।" তিনি বলিলেন,—"দেখ, জগতের সকল বস্তুই এক—কেবল নাম ও রূপের ভেদ মাত্র। আমি প্রত্যক্ষবাদী, তাহা ত জান। এক্ষণে তাহার দৃষ্টান্ত এই ময়লা হইতেই দেখাইব।" এই বলিয়া সেই হাতের ময়লাটুকু দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমিকা দ্বারা পাকাইতে লাগিলেন। ইহাতে ঐ ময়লাটীর আকার ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল। বাবা বলিলেন,—"ছোট-বড়, আকার ভেদ মাত্র।" সেই সময় একটি তীব্র সুগন্ধ বাহির হইতে লাগিল। যখন ময়লাটির আকার বৃদ্ধি হইয়া একটী মটর অপেক্ষা বড় হইল, তখন উহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—"দেখ, উহার বর্ণ কেমন পরিবর্ত্তন হইতেছে।" আমি হাতে করিয়া দেখিলাম যে উহার বর্ণ ক্রমশঃ বেশ সুন্দর নীল ও স্বচ্ছ হইতেছে, কিন্তু তখনও বেশ নরম আছে। আমার হাত হইতে আরও তিনজনে উহা দেখিয়া পুনরায় উহা

আমার হাতে দিলেন। তখন উহা একটি সুন্দর নীলা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম,—"বাবা, আমাকে উহা দিন, আমি উহা আঙ্গটিতে বসাইয়া লইব।" তাহাতে বাবা বলিলেন,—"নীলার তাড়িতশক্তি অত্যন্ত তীব্র। উহা ধারণ করিলে আমিরও হইতে পার, আবার ফকিরও হইতে পার। এই-রূপ অনিশ্চিত বস্তু তোমাকে দিতে পারি না। উহা আমার হাতে দেও, আমি উহার তাড়িত বা তেজ কমাইয়া দিব।" আমি তাঁহার হাতে দিলাম। দিবামাত্র আবার সুগন্ধ বাহির হইতে লাগিল।

১৩১৪ (ইং ১৯০৭) সালের ১লা বৈশাখ আমি বাবার নিকট দীক্ষা লই। তখন বাবা গুস্করায় কাছারি বাড়ীতে থাকিতেন। ১৩১৭ সালে যখন তিনি বর্দ্ধমানে ছিলেন তখন আমি একদিন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বর্দ্ধমানের বাসায় যাই। তখন বেলা প্রায় ১২টা। তিনি আমার সহিত কথা কহিয়া আমাকে বসিতে বলিয়া নিকটস্থ একটী লোকের অসুস্থ ছেলেকে দেখিতে যান। আমি সেই দিনই ডাউন বম্বে মেলে বেলা ২টার সময় রওনা হইয়া পুনরায় হাওরায় ফিরিব, এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলাম। তখন বম্বে মেলের সেইরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাবা প্রায় ২॥০টার সময় ফিরিলেন এবং আমাকে জল খাওয়াইয়া বলিলেন,—"এইবার তুমি যাইতে পার।" আমি বলিলাম,—"আমার মেলে যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাকে লোকাল ট্রেনে

যাইতে হইবে।" তাহাতে বাবা বলিলেন;—"দেখ, ষ্টেশনে এখন যাইলেই তুমি কোন না কোন ট্রেন পাইবে যাহাতে তোমার শীঘ্র হাওড়ায় যাওয়া হইবে। তুমি এখনই যাও।" আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম বোম্বে মেল দাঁড়াইয়া আছে, গাড়ী লেট ছিল।

ইহার প্রায় ৬ মাস পরে আশ্বিন মাসে পুনরায় একদিন বাবাকে দেখিবার জন্য বর্দ্ধমান যাই। তখন বর্দ্ধমানে বিশুদ্ধাশ্রমের জায়গাটা লওয়া হইয়াছে। তিনি আমাকে ঐ জায়গাটী দেখাইবার জন্য সঙ্গে আনিলেন এবং সেখানে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম,—"পাঁচটার ডাউন এক্সপ্রেসে আমাকে ফিরিতে হইবে।" তিনি বলিলেন,—"অদ্য এখানে থাকিলে ভাল হয়। যাহা হউক, আমি ফিরিয়া আসিলে সে সম্বন্ধে কথা হইবে।" আমি পৌনে পাঁচটা পর্য্যন্ত বসিয়া তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ষ্টেশনে এক্সপ্রেস ধরিলাম ও হাওড়ায় ফিরিয়া দেখিলাম কলিকাতায় ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া জলপ্লাবন হইয়াছে। কোনও গাড়ী যাইতে চাহিল না—অগত্যা পদব্রজে ষ্ট্রাণ্ড রোডে জল ভাঙ্গিয়া চারি ঘণ্টার পরে বাড়ী পৌঁছিলাম। এই ঘটনার কথা বাবাকে জানাইলে তিনি লিখিলেন, তিনি সেই জন্যই আমাকে সে দিন বর্দ্ধমানে থাকিতে বলিয়াছিলেন।

মথুরা বৃন্দাবন হইয়া হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। পাণ্ডা পান্নালাল কুম্ভকর্ণের নির্দ্দিষ্ট একটি বাসাতে আমরা উঠিলাম।

সেই সময়ে উক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর ভীষণ টায়ফড জ্বর হয়। উঁহার পিতা কলিকাতার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ঐ একমাত্র কন্যার ব্যারামে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া আমাদের হরিদ্বারের বাসায় বাবাকে তার করিয়া কন্যার অসুখের কথা জ্ঞাপন করিয়া উত্তরে আশী-র্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। বাবা ঐ তারের জবাব লিখাইয়া আমাকেই ডাক ঘরে পাঠান এবং বলেন,—"এখন সতীশের পত্নী মরিতে পারে না।" বাবার আদেশে উত্তর দিলাম—"Accept my blessings. Wire present condition." পরদিন আবার তার আসিল। বাবা বলিলেন,—"কালীর জ্বরের প্রকোপে ফীট হইয়াছে। ডাক্তারেরা মনে করিয়াছে সে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। সে জীবিত আছে এবং শীঘ্রই সংজ্ঞালাভ করিবে। ক্ষেত্র, তুমি এই তারের জবাবে উমেশকে লিখিয়া দাও 'কালী উপস্থিত কেমন আছে জানাইবে'।" আমিও সেই মত তার পাঠাইলাম। সেই দিনই বৈকালে উত্তর আসিল,—"Kali regained consciousness, but condition still precarious." কালীর জ্ঞান আসিয়াছে বটে কিন্তু অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক। বাবা উত্তরে কালী কেমন থাকে সংবাদ দিতে বলিলেন। পরদিন একটি বড় তার উমেশ বাবু পাঠাইলেন, লিখিলেন,—"কালী যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, আদৌ ঘুমাইতে পারিতেছে না।" তখন প্রায় সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। বাবা পূজায় বসিবার পূর্ব্বে বলিলেন,-"যাই, কালীকে দেখিয়া আসি।

যাইতে হইবে।” তাহাতে বাবা বলিলেন;—“দেখ, ষ্টেশনে এখন যাইলেই তুমি কোন না কোন ট্রেন পাইবে যাহাতে তোমার শীঘ্র হাওড়ায় যাওয়া হইবে। তুমি এখনই যাও।” আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম বোম্বে মেল দাঁড়াইয়া আছে, গাড়ী লেট ছিল।

ইহার প্রায় ৬ মাস পরে আশ্বিন মাসে পুনরায় একদিন বাবাকে দেখিবার জন্য বর্দ্ধমান যাই। তখন বর্দ্ধমানে বিশুদ্ধাশ্রমের জায়গাটা লওয়া হইয়াছে। তিনি আমাকে ঐ জায়গাটী দেখাইবার জন্য সঙ্গে আনিলেন এবং সেখানে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম,—“পাঁচটার ডাউন এক্সপ্রেসে আমাকে ফিরিতে হইবে।” তিনি বলিলেন,—“অদ্য এখানে থাকিলে ভাল হয়। যাহা হউক, আমি ফিরিয়া আসিলে সে সম্বন্ধে কথা হইবে।” আমি পৌনে পাঁচটা পর্য্যন্ত বসিয়া তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ষ্টেশনে এক্সপ্রেস ধরিলাম ও হাওড়ায় ফিরিয়া দেখিলাম কলিকাতায় ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া জলপ্লাবন হইয়াছে। কোনও গাড়ী যাইতে চাহিল না—অগত্যা পদব্রজে ষ্ট্রাণ্ড রোডে জল ভাঙ্গিয়া চারি ঘণ্টার পরে বাড়ী পৌঁছিলাম। এই ঘটনার কথা বাবাকে জানাইলে তিনি লিখিলেন, তিনি সেই জন্যই আমাকে সে দিন বর্দ্ধমানে থাকিতে বলিয়াছিলেন।

মথুরা বৃন্দাবন হইয়া হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। পাণ্ডা পান্নালাল কুম্ভকর্ণের নির্দ্দিষ্ট একটি বাসাতে আমরা উঠিলাম।

সেই সময়ে উক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর ভীষণ টায়ফড জ্বর হয়। উঁহার পিতা কলিকাতার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ঐ একমাত্র কন্যার ব্যারামে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া আমাদের হরিদ্বারের বাসায় বাবাকে তার করিয়া কন্যার অসুখের কথা জ্ঞাপন করিয়া উত্তরে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। বাবা ঐ তারের জবাব লিখাইয়া আমাকেই ডাক ঘরে পাঠান এবং বলেন,—"এখন সতীশের পত্নী মরিতে পারে না।" বাবার আদেশে উত্তর দিলাম—"Accept my blessings. Wire present condition." পরদিন আবার তার আসিল। বাবা বলিলেন,—"কালীর জ্বরের প্রকোপে ফীট হইয়াছে। ডাক্তারেরা মনে করিয়াছে সে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। সে জীবিত আছে এবং শীঘ্রই সংজ্ঞালাভ করিবে। ক্ষেত্র, তুমি এই তারের জবাবে উমেশকে লিখিয়া দাও 'কালী উপস্থিত কেমন আছে জানাইবে'।" আমিও সেই মত তার পাঠাইলাম। সেই দিনই বৈকালে উত্তর আসিল,—"Kali regained consciousness, but condition still precarious." কালীর জ্ঞান আসিয়াছে বটে কিন্তু অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক। বাবা উত্তরে কালী কেমন থাকে সংবাদ দিতে বলিলেন। পরদিন একটি বড় তার উমেশ বাবু পাঠাইলেন, লিখিলেন,—"কালী যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, আদৌ ঘুমাইতে পারিতেছে না।" তখন প্রায় সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। বাবা পূজায় বসিবার পূর্ব্বে বলিলেন,—"যাই, কালীকে দেখিয়া আসি।

৮

তাহার বিষম যন্ত্রণার উপশম করিয়া দিব, কিন্তু তাঁহার আরোগ্য লাভ করিতে এখনও বিলম্ব আছে।"

ইহার পরদিন আমরা ৺কাশীতে ফিরিয়া কেদারঘাটের উপর হরি বাবুর গদীতে উঠিলাম। আমরা দলে ২০।২২ জন ছিলাম। বাবাকে লইয়া আমরা যে ঘরটীতে বসিতাম উহার পার্শ্বেই প্রস্রাবের জায়গা ছিল। অনেকে থাকায় প্রস্রাবের দুর্গন্ধ ছাড়িত। আমি বাবাকে বলিলাম,—"ওখানে ফেনাইল ছড়াইলে ভাল হয়।" বাবা বলিলেন,—"বেশ, ফেনাইল লইয়া আইস।" আমি বলিলাম,—"কেন আবার কষ্ট করিয়া দশাশ্বমেধে যাই—আপনি ত ইচ্ছাশক্তিতে ফিনাইল করিতে পারেন। খানিকটা তৈয়ার করিয়া দিন, আমি ছড়াই।" তিনি বলিলেন,—"বেশ আমি তোমাকেই বিজ্ঞানবলে ফেনাইল প্রস্তুত করিতে শিখাইব। তুমি একটি নূতন মৃন্ময়পাত্র জলপূর্ণ করিয়া লইয়া আইস। দেখ, সূর্য্যকে আমরা সবিতা বলিয়া থাকি। সূর্য্যরশ্মি হইতে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। আমি উহা দেখাইতে পারি। অদ্য তোমাকে শিখাইব। ইহাতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন নাই।"আমাকে উহার প্রক্রিয়া বা processটী দেখাইয়া দিলেন। আমি সেইরূপ করায় পাত্রটীর তলদেশে একটী শ্বেতবর্ণের সিকনির ন্যায় দাগ পড়িল এবং পরক্ষণেই ঐ দাগ হইতে বুদ্‌বুদ উঠিতে লাগিল। পার্শ্বে বাবা উপস্থিত ছিলেন, দেখিয়া বলিলেন,—"দেখ, কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্রই জলটি ফিনাইলে পরিণত হইবে।" ৮।১০ মিনিটের মধ্যে তাহাই হইল। সেইরূপে ঐ

বাড়ীতে আমি উপর্য্যুপরি তিন দিন ফিনাইল প্রস্তুত করিয়াছিলাম। পরে বাড়ী ফিরিয়া আমাদের প্রতিবেশী আলিগড়ের উকিল ৺রাসবিহারী দাসকে দেখাইবার জন্য একদিন ঐরূপ ফিনাইল প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং বাবাকে জানাইয়াছিলাম যে আমি এইরূপ ফিনাইল প্রস্তুত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করি। উত্তরে তিনি বলিলেন,—"এইরূপ উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা নিষেধ। তুমি উহা বিক্রয় করিও না।" আমিও ফিনাইল প্রস্তুত করার অভ্যাস ছাড়িয়া দিলাম।

১৩১৯ সালের পূজার ছুটিতে আমরা ১৫।১৬জন বাবাকে লইয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণে বাহির হই। ভ্রমণ পথে বাবার অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। উহার মধ্যে ২।১টার কথা লিখিলাম। যখন প্রভাতে ট্রিচিনাপল্লী হইয়া শ্রীরঙ্গমজীর মন্দিরদ্বারের বাসায় উঠি, বাবা আমাকে আদেশ করিলেন,—"ক্ষেত্র, পদ্মফুল লইয়া আইস। আমি অদ্য পদ্মফুল দিয়া পূজা করিব।" আমি বলিলাম,—"এ বিদেশে কেহ আমার কথা বুঝে না, আপনি কৃপা করিয়া কোথায় পদ্ম পাইতে পারি, একটু নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" তিনি বলিলেন,—"দেখ, আমি পদ্মের দিব্য গন্ধ অতি নিকটেই পাইতেছি। তুমি সামনের দিকে রশি খানেক পথ গেলেই পুষ্করিণীতে পদ্ম পাইবে। শীঘ্র লইয়া আইস।" সকলেই অবাক্। আমরা কেহই কোনও পদ্মের আঘ্রাণ পাই নাই। কেবল বাবাই নিজ অপূর্ব্ব শক্তি প্রভাবে পদ্মগন্ধ অনুভব করিতেছেন। যাহা হউক,

আমি আদেশ মত একটি বস্তী পার হইয়া একটি সরু রাস্তায় মেয়েরা বাসন মাজিয়া আনিতেছে দেখিয়া মনে করিলাম অদূরে পুকুর আছে! সেই রাস্তায় কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি, এক ক্ষুদ্র পুকুর। কিন্তু উহাতে অনেক পদ্ম কিনারার অতি নিকটেই ফুটিয়া রহিয়াছে। অনায়াসে অনেকগুলি তুলিয়া আনিলাম ও বাবাকে পূজার জন্য দিলাম।

আমরা যখন ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাঞ্চী ষ্টেশনে নামিয়া শিবকাঞ্চীতে যমুনা বাইয়ের ধর্ম্মশালায় উঠিলাম, তখন সেখানকার কলে জল ছিল না। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার বলিলেন,—"অনতিপূর্ব্বে জল চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না। দূরে সর্ব্বতীর্থ নামে পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে হইবে।" বাবাকে বলিলাম,—"কল আছে, কিন্তু জল নাই। বড়ই কষ্ট, হাত মুখ ধুইতে পাইতেছিনা; উপায় করিয়া দিন।" বাবা বলিলেন,—"কেন বলিতেছ জল নাই? যাও, পুনরায় দেখ দেখি জল পাও কি না।" বাবার আদেশ মত পুনরায় কলের ট্যাপ খুলিয়া দেখি, বেশ জোরে জল আসিতেছে। আসিয়া সে বিষয় বাবাকে বলায় বলিলেন,—"এ জল কিন্তু এক ঘণ্টার বেশী থাকিবে না। আবশ্যকমত জল সংগ্রহ কর।" তাহাই হইল। এক ঘণ্টার পরেই আবার জল চলিয়া গেল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মশালার ম্যানেজার ও তাঁহার আফিসের লোকজন বাবাকে অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন যোগী বলিয়া বিশেষ মান্য করিল এবং পরদিন দলে দলে স্থানীয় বাসিন্দা বাবাকে দেখিতে আসিল।

আমাদেরও শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী দেখিবার সময় খুব খাতির হইল।

গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় কতবার কত জায়গায় পাইয়াছি, তাহা লিখিয়া ফুরান অসম্ভব। একবার কাশীতে অবস্থানকালে বাবা বলিলেন,—"দেখ, শরীর ব্যাধি-মন্দির। শরীর থাকিলেই অসুখ আছে। আজ আমার বেলা ১টার সময় জ্বর আসিবে।" সঙ্গে অন্যান্য ভাইদের মধ্যে খিদিরপুরের বড় বাড়ীর ষ্টেটের ম্যানেজার ভিখুরাম ঘোষাল মহাশয় ছিলেন। বাবা বলিলেন,—"ভিখু, অদ্য তোমরা সব শীঘ্র আহারাদি করিয়া লও।" পরে বেলা ১২টা ৫৩ মিনিটের সময় ভিখুদা বাবার হাত দেখিয়া বলিলেন,—"জ্বর নাই, নাড়ী সহজ।" ১২।৫৫ মিনিটের সময় বলিলেন,—"নাড়ীতে যেন সামান্য বেগ হইয়াছে।" ঠিক ১টার সময় দেখিলেন, জ্বর স্পষ্ট হইয়াছে। ভিখুদা বলিলেন,—"একটি থারমোমিটার পাইলে ভাল হয়।" বাবা গায়ে কম্বল চাপা দিয়া বলিলেন,—"ভিখু, আমার ব্যাগ খুলিয়া ঠিক নিম্নে হাত দাও। একটি থারমোমিটার পাইবে। লইয়া আমার উত্তাপ পরীক্ষা কর।" ভিখুদা বাবার ব্যাগে সেইমত হাত দিয়া একটি নূতন তাপমান যন্ত্র পাইয়া দেখিলেন, বাবার উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রী উঠিয়াছে এবং তিনি জ্বরে কাঁপিতেছেন। আমরা সকলেই বিমর্ষ। বাবা বলিলেন,—"এ জ্বর দুই ঘণ্টা থাকিবে।" তাহাই হইল। ঠিক তিনটার সময় দেখা গেল জ্বর নিবৃত্ত হইয়াছে। বাবা যেন সহজ মানুষ। কিন্তু

একটু দুর্ব্বল হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল। আদেশ করিলেন,—"ভিখু, থারমোমিটারটি ব্যাগে রাখিয়া দাও। উহাকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব।" ব্যাগে রাখিয়া বন্ধ করিয়া পরক্ষণে ব্যাগ খুলিয়া দেখা গেল যন্ত্রটি আর ব্যাগ মধ্যে নাই।

১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে আমরা বাবাকে লইয়া অম্বুবাচীর দুই দিন পূর্ব্বে কামাখ্যা যাই। সেখানে আমি বাবার আদেশে রাত্রি ৪টার সময় ৺মায়ের পূজার জন্য মন্দির মধ্যে প্রবেশ করি। আমাদের মধ্যে অন্য কেহই বাবার সঙ্গে যাইবার অনুমতি পান নাই। পাণ্ডাঠাকুরও নিম্নে আসেন নাই। গুরু-ভাইদের মধ্যে কেবল ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু (যিনি এখন কলিকাতা করপোরেশনের কলেক্টর) ও সত্য গোপাল দত্ত (অমৃতবাজার পত্রিকার সব-এডিটর) মন্দির-মধ্যে প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও নীচে যাইতে অনুমতি পান নাই। নীচে নামিয়া বাবা আসনে বসিয়া আমাকে নিকটে বসিতে অনুরোধ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই খরস্রোতের খরতর শব্দ ও চটাপট করিয়া অসংখ্য বিদ্যুতের শব্দ হইতে লাগিল ও সিংহনাদে মন্দিরাভ্যন্তর ধ্বনিত হইল। ইহার অধিক আর লিখিতে পারি না। মনে হইল মুহূর্ত্ত পরে বাবা আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন,—"এই লও রক্ত-বস্ত্র, পীঠস্থানে হাত দিয়া দেখ উহা কিরূপ প্রদাহে উত্তপ্ত হইয়াছে।" আমি হাতে খুব গরম অনুভব করিলাম এবং মাকে প্রণাম করিয়া বাবার সহিত উপরে উঠিয়া মন্দির

বাহিরে আসিলাম। এরূপ অলৌকিক ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে কখনও কোন মন্দিরে দেখি নাই। হিন্দুর পীঠগুলি যে সাক্ষাৎ মায়ের স্থান, তাহার উপলব্ধি সঙ্গে সঙ্গে হইল।

যোগীর নিকটে দেশ ও কালের ব্যবধান থাকে না—তাহার দৃষ্টান্ত অনবরত বাবার নিকটে পাইয়া থাকি। যখনই সুদূরে নিভৃতে বাবার বিষয় চিন্তা করি, তাঁহার দিব্যগন্ধ তখনই অনুভূত হয়। এমন কি, আমরা কয়েকজন গুরুভাই একত্রে থাকিয়াও বাবার এইরূপ উপস্থিতি অনেকবার দেখিতে পাইয়াছি। যখন আশ্রমের জন্য ৺কাশীতে বাগানবাটী খরিদ হয়, সে সময় জ্যৈষ্ঠ মাস, কাশীতে খুবই গরম। তখন আমি, পূর্ব্বোক্ত ভিখুরাম ঘোষাল, গোপীনাথ কবিরাজ (যিনি এখন বেনারস গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল) ও সতীশচন্দ্র দে (যিনি কাশীর জমিদার ও উকিল) দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর বৈকালে বসিয়া বাবার কথা বিশেষ আলোচনা করিতাম। বাবা সেই সময়ে সুদূরে ৺পুরী আশ্রমে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অপূর্ব্ব গন্ধে আমাদিগকে একত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে বিভোর করিয়া দিতেন। এরূপ একদিন অথবা একবার নহে, বহুবার বহুদিন হইয়াছে। গোপীদাকে আমি এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"মহাপুরুষকে আসিতে হয় না, একটু দৃষ্টি করিলেই তাঁহার বিভূতি আমরা অনুভব করিতে পারি।"

গুরুদেবের বিরাট্ ভাব আমি সম্যক্ অনুভব করি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার লোমকূপের যে বিরাট্ সম্প্রসারণ দেখিয়াছি

তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইতে হয়। গাত্রে প্রদাহ হয় বলিয়া শীতল রাখিবার উদ্দেশ্যে বাবা গায়ের ভিতর অনেকগুলি স্ফটিক পুরিয়া রাখেন। এরূপ স্ফটিক মধ্যে মধ্যে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ঝড়িয়া পড়ে এবং কখনও বা তিনি দেখাইবার জন্য লোমকূপ সম্প্রসারণ করিয়া বাহির করেন। কখনও আমরা হস্তের অথবা বক্ষের পার্শ্বদেশে স্ফীত মাংস দেখিয়া স্পর্শ দ্বারা অনুভব করি যে উহার অভ্যন্তরে স্ফটিক গজ গজ করিতেছে। কখনও বাবা উহা অঙ্গুলিস্পর্শে ভিতরে ঢুকাইয়া রাখেন, কখনও বা লোমকূপ ফাঁক করিয়া বাহির করিয়া লয়েন। একবার ৺পুরীধামের আশ্রমে সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ একটি স্ফটিক নিজ গাত্র হইতে নির্গত করিয়া আমার একটি কন্যার হস্তপেশীর মধ্যে তাহার লোমকূপ প্রসারিত করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। ২।৩ ঘণ্টা উহা তাহার হাতের উপর স্ফীতভাবে অবস্থান করে। তাহাতে আমার কন্যা বিরক্ত হইয়া বাবাকে বলায় তিনি হাত দিয়া চাপিয়া ঐ স্ফটিকটী আমার কন্যার হস্ত মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। এখনও উহা সেইরূপেই আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু হাত দিয়া আমরা আর তাহা দেখিতে পাই না।

১৩৩৪ সালের কার্ত্তিক মাসে আমরা বাবাকে লইয়া ৺কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল যাই। সেখানে ভগলু পাণ্ডার মুখে তাঁহার অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করিতেছি। ভগলু বলিল,—

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বাবা যখন বিন্ধ্যাচলে যোগাভ্যাস করিতেন, তখন তিনি লাহিড়ায়া জঙ্গলের মধ্যে থাকিতেন এবং ভগলুর পিতা প্রত্যহ বাবাজীর জন্য রুটি দিয়া আসিতেন। একদিন ভগলু বিন্দুবাসিনীর ঘাটে খেলা করিতেছিল-তখন তাহার বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে। বাবা প্রায় ৩টার সময় সেই ঘাটে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া ভগলুকে ডাকিলেন। ভগলু বলিল,—"কেন ভাইয়া ?" বাবা গলা হইতে স্ফটিক মালা খুলিয়া তাহার হাতে দিলেন এবং ঝুলিটি দিয়া বলিলেন,—"ভগলু, তুমি এইগুলি লইয়া একটু বস, আমি গঙ্গায় স্নান করিব।" ভগলু বলিল,—"ভাইয়া, ঘাটের বাম দিকে যাইও না, ঘূর্ণি আছে, ডুবিয়া যাইবে।" কিন্তু বাবা যেন সে কথা শুনিতে পান নাই এরূপভাব দেখাইয়া পরক্ষণেই সেই ঘূর্ণি মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ঘূর্ণিতে একপাক ঘুরিয়া জলমধ্যে তলাইয়া গেলেন। ভগলু বলিল,—"আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।" চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া ঘাটের পুলিস সেপাহী নিকটে আসিয়া ভগলুকে এরূপ আকস্মিক চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ভগলু দেখিল মহাবিপদ, যদি বলে লোক ডুবিয়াছে, তাহা হইলে সেই লোকের দ্রব্যাদি তাহার হাতে দেখিয়া হয়ত সেপাহি উহাকে থানায় টানিয়া লইয়া যাইবে। এই ভয়ে সে প্রকৃত কথা না বলিয়া উত্তর করিল,—"এক সন্ন্যাসী তাহাকে এই দ্রব্য কয়টি দিয়া অনেকক্ষণ হইল গিয়াছে, সে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং সন্ন্যাসীও আসিতেছে না। পাহাড়াওয়ালা

তাহাকে আরও কিছুক্ষণ সেইখানে অপেক্ষা করিতে বলিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। ভগলু কি করে—কি করিয়া সে গৃহে ফিরিয়া তাহার পিতাকে ভাইয়ার জলমগ্ন হওয়ার সংবাদ দিবে ভাবিয়া আকুল হইল এবং ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। যখন সন্ধ্যা হয়-হয় এবং ভগলু কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, বাবা তখন হাসিতে হাসিতে ভগলুকে পশ্চাৎদিক হইতে গা মুছিতে মুছিতে ডাকিলেন। ভগলু একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীভিখুরাম ঘোষাল

খিদিরপুর বড়বাড়ী, কলিকাতা।

বিগত বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাসে আমি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস গুরুদেবের সহিত ৺কাশীধামে বিশুদ্ধানন্দ-কুটীর নামক তাঁহার আশ্রমে আসি এবং ঐ আশ্রমে তাঁহার সঙ্গে প্রায় ৬।৭ মাস কাল থাকি। তৎকালে তাঁহার যে সকল অলৌকিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

ঐ সময়ে বাবার অনেক শিষ্য ও ভক্ত ঐ আশ্রমে যাওয়া-আসা করিতেন ও থাকিতেন। কিন্তু আমি তাঁহার কাছে প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতাম। একদিবস বিকালে বাবা আশ্রমের দ্বিতলে একটি গৃহে বসিয়াছিলেন—তথায় আমি ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাবার পান খাইবার ইচ্ছা হইল। তথায় অন্য কেহ না থাকায় আমিই পান তৈয়ার করিবার জন্য দ্বিতলের ভাড়ার ঘরের মধ্যে যাইয়া তথায় ৪।৫ মিনিটের মধ্যে পান তৈয়ার করিয়া বাবার ঘরের মধ্যে আসিলাম, দেখিলাম বাবা তথায় নাই। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,— "বাবা

এই যে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন।” তারপর আশ্রমবাটীর দ্বিতল, ত্রিতল ও একতালার সমুদয় গৃহাদি অনুসন্ধান করিলাম ও বাটীর বাহিরে যাইয়াও দেখিয়া আসিলাম, কিন্তু বাবাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পরে দ্বিতলের যে গৃহে বাবা ছিলেন সেই গৃহে পুনর্বার বিহারী চট্টোপাধ্যায় ও আমি যাইয়া তথায় ২।১ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বাবার কথা শুনিতে পাইলাম। বাবা আমাদের নিকটেই অথচ অদৃশ্য থাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—“আমি ত তোমাদের সাম্‌নেই আছি। তোমরা যদি আমাকে দেখিতে না পাও, আমি কি করিব?” এইরূপে প্রায় ২।৩ মিনিটকাল তিনি অদৃশ্য থাকিয়া আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, অথচ আমরা সেই স্থানে থাকিয়া ও চতুর্দ্দিকে ঘোরাফেরা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তারপর হঠাৎ দেখি তিনি আমার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া আছেন ও হাসিতেছেন। তৎক্ষণাৎ আমরা আশ্চর্য্য ও পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁহার জন্য যে পান তৈয়ার করিয়া আনিয়াছিলাম তিনি আনন্দে তাহা খাইতে লাগিলেন।

একদিন এক বাজিকর বাজি খেলিতে আইসে। বাবার বাজি দেখিবার খেয়াল হইল এবং আশ্রমের সামনে বাজি খেলাও আরম্ভ করাইয়া দেওয়া হইল। বাজিকর ২।৩টি বাজি খেলিবার পর একটি কাপড়ের থলি, তাহার ঝুলির মধ্য হইতে

বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। তাহা ভাল করিয়া দেখিলাম ও ঝাড়িলাম—তাহার মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাজিকর সেই থলি মৃত্তিকার উপর রাখিয়া একখানি হাড় তাহাতে ছোঁয়াইয়া "হিজি বিজি" কত কি বকিতে লাগিল। তারপর থলিটি যেমন সে উঠাইয়া লইয়া ঝাড়িল অমনি ঝন্ ঝন্ করিয়া কয়েকটি টাকা তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল—গণিয়া দেখা গেল ১৬৲ ষোলটি টাকা। তখন বাবা বাজিকরকে বলিলেন,—"ঐ টাকাগুলি পুনর্ব্বার থলির মধ্যে রাখিয়া থলিটি পূর্ব্বমত মৃত্তিকার উপর রাখ, তার উপর একখানি কাপড় চাপা দেও।" বাজিকর তাহা করিতে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিল বটে, কিন্তু পরে বাবার কথানুযায়ী টাকাগুলি থলির মধ্যে রাখিয়া থলিটী মৃত্তিকার উপর রাখিল ও এক টুকরা কাপড় চাপা দিল। ২।১ মিনিট পরে বাবার আদেশমত বাজিকর কাপড়ের টুকরা সরাইয়া থলিটি লইয়া যখন ঝাড়িল তখন তাহার মধ্য হইতে টাকাগুলি পড়িল না, এমন কি থলির মধ্যে কোন টাকা দেখাই গেল না। বাজিকর আশ্চর্য্য ও বিষণ্ণ হইয়া টাকার জন্য বারংবার কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বাবার দয়া হইল এবং তাঁহার আদেশমত বাজিকর তাহার ঝুলি মৃত্তিকা হইতে উঠাইবামাত্র মৃত্তিকার উপর টাকাগুলি দেখিতে পাইল। টাকা ও ঝোলাঝুলি লইয়া বাজিকর তৎক্ষণাৎ অতি ব্যস্তভাবে ও দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিল। বারংবার বলা সত্ত্বেও সে আর বাজি দেখাইল না।

একদিন বেলা আন্দাজ দুইটার সময় কলিকাতা হাই-কোর্টের উকিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বৰ্দ্ধমান জজকোর্টের উকিল কালাচাঁদ মজুমদার, ভূতপূৰ্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট গিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা মিউনিসিপাল কালেক্টর যোগেশচন্দ্র বসু, ও জমিদার প্রকাশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি দশ বারজন বাবার শিষ্য ঐ আশ্রমের দ্বিতলের গৃহে বসিয়া নিজেদের মনের কথা বলিয়া দিবার জন্য বাবাকে অতি যত্ন ও জেদ করিয়া ধরিয়া বসিলেন। বাবাও খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া আদেশ করিলেন,—"তোমরা অপর একটি ঘরে বসিয়া একখানি কাগজে যে যাহার মনের কথা নিজ হাতে লিখ, কিন্তু যেন এক এক জনের লেখা এক এক ছত্রের বেশী না হয়।" আমরা সকলে বাবার ঐ আদেশানুসারে দ্বিতলের অপর একটি ঘরে বসিয়া যে যাহার মনের কথা ঐরূপ ভাবেই লিখিলাম। তাহা বাবাকে জানান হইল ; কিন্তু কি কি লেখা হইল তাহা বাবাকে শুনান হইল না ও কাগজগুলিও তাঁহাকে দেখান হইল না। তাহার পর বাবার আদেশমত ঐ লিখিত কাগজগুলি ঐ ঘরে বসিয়া ক্ষুদ্রাকারে মুড়িয়া ঠিক অৰ্দ্ধ টাকা বা একটি আধুলীর মত ছোট আকারে আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হইল ও তাহা বাবাকে জানান হইল। পরে বাবা আশ্রমের ত্রিতল গৃহে উঠিয়া যাইলেন। আন্দাজ দশ মিনিট পরে দ্বিতলের গৃহে নামিয়া আসিয়া, আমরা ঐ দগ্ধ কাগজখানিতে নিজ নিজ হস্তাক্ষরে যাহা যাহা লিখিয়াছিলাম, ঠিক ঠিক সেই

সেই হস্তাক্ষরে লিখিত সেই সেই বিষয়-যুক্ত এক একখানা কাগজ আমাদিগকে দিলেন। আমরা অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম এবং উপরোক্ত গিরীন্দ্র বাবু বাবাকে বলিলেন,—"ইহাতে আমরা খুব আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি ও আনন্দ পাইয়াছি, কিন্তু আমাদিগের একটী প্রার্থনা এই যে, আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ভবিষ্যৎ ফলাফল দয়া করিয়া কিছু বলিয়া দিন।" তাহাতে বাবা পূর্ব্বোল্লিখিতমত অপর একটি ঘরে বসিয়া একখানি কাগজে এক এক ছত্রে যে যাহার প্রশ্ন নিজ নিজ হস্তে লিখিতে ও তাহা উপরোক্ত মতে মুড়িয়া পোড়াইতে সকলকে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কাগজে প্রশ্ন লেখা ও পোড়ান হইল এবং তৎসংবাদ বাবাকে জানান হইল, কিন্তু কি কি লেখা হইয়াছিল তাহা বাবাকে শুনান হইল না বা লিখিত কাগজখানি তাঁহাকে দেখান হইল না। পরে বাবা সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে রাত্রি আন্দাজ নয়টার পর একখানি কাগজ আমাদের হস্তে দিলেন। ঐ কাগজখানির একপার্শ্বে আমাদের হস্তাক্ষরযুক্ত প্রশ্নগুলি এবং অপর পার্শ্বে অন্যের হস্তাক্ষরে সেই প্রশ্নের ভবিষ্যৎ ফলাফলের উত্তর বিস্তারিতভাবে লিখিত ছিল। ভবিষ্যতে ঐ উত্তর অনুসারে সকলেরই ফলাফল মিলিয়া গিয়াছে।

আশ্রমে আমি বাবার যথাসাধ্য সেবাদি করিতাম। আশ্রমের বাজার করা ও অন্যান্য কার্য্যের ভার তৎকালে আমারই উপর ছিল। বাবা তৎকালে প্রত্যহ রাত্রি ১০টার সময় যোগ-গৃহে প্রবেশ করিতেন ও পরদিবস বেলা প্রায় নয়টার সময় সেখান

হইতে বাহির হইতেন। কোন কোন দিন বাহির হইতে বেলা দশটাও বাজিয়া যাইত। অধিক বেলা হইয়া গিয়াছে এইরূপ কোন কথা বলিলে বাবা বলিতেন যে কোন কারণে তাঁহাকে কোন দূরস্থ প্রদেশে যাইতে হইয়াছিল। এইরূপ মধ্যে মধ্যে বেলা হইত এবং তাহা কথা প্রসঙ্গে উত্থাপন করিলে কোন দূরদেশে তাঁহার যাওয়া হইয়াছিল এইরূপ তিনি প্রকাশ করিতেন। এক সময়ে, অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের ৺শারদীয়া পূজার অবকাশে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত গিরীন্দ্র বাবু, যোগেশ বাবু, সতীশ বাবু, ক্ষেত্রগোপাল বাবু, প্রকাশ বাবু প্রভৃতি বাবার অনেক শিষ্য ৺কাশী-আশ্রমে আইসেন এবং প্রায় মাসাবধি কাল বাবার কাছে থাকেন। আমি প্রত্যহ প্রাতে দশাশ্বমেধ ঘাটের বাজারে বাজার করিতে যাইতাম এবং বাবার যোগ-গৃহ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ বেলা নয়টার মধ্যেই বাজার হইতে ফিরিয়া আসিতাম। এক দিবস বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিতে আমার বিলম্ব হইয়া যায়। তাহাতে আমি বিশেষ চিন্তিত হই। যেহেতু বাবা যোগ-গৃহ হইতে বাহির হইলেই শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে ৺পূজার স্নানজল বিতরণ করা ও বাবার সেবাদি কয়েকটি কার্য্য আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। সেই দিন বাজারে বিলম্ব হওয়ার দরুণ উক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটী হইল বলিয়া বাজার হইতে ফিরিবার কালে রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে আসি। আমার সঙ্গে একটি ভদ্রলোক ও দ্রব্যাদি মাথায় দুইটী মজুরাণী ছিল। তাহারা আমার অনেক

পশ্চাতে পড়িয়াছিল। আমি যখন বেলা আন্দাজ দশটার সময় আশ্রমের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম অর্থাৎ আশ্রমের পূর্ব্বদিকে আন্দাজ পঞ্চাশ হস্ত অন্তরে আসিলাম, তখন আশ্রমের ত্রিতলে বাবার থাকিবার গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলাম যে, বাবা শূন্যমার্গে দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া ত্রিতলের গৃহের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডা ডিঙ্গাইয়া ঐ গৃহের পূর্ব্বদিকের জানালার লোহার গরাদের তিন ইঞ্চি ফাঁকের মধ্যে মাথা প্রবেশ করাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তৎকালে তাঁহার দেহ খুব সূক্ষ্ম ও শীর্ণ বোধ হইল কিন্তু মুখের কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। এই অবস্থায় আমি ছাড়া আমার পার্শ্ববর্ত্তী এক বয়ঃস্থা নাগপুরী মহিলা ও একজন মুসলমানের দৃষ্টি তাঁহাতে পড়িয়াছিল। আমি ঐ অবস্থা দেখিবামাত্র ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম ও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, যোগ-গৃহ হইতে মধ্যে মধ্যে বাবার বাহির হইতে বিলম্ব হইলে বাবা যে বলেন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন তাহা আজ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মনের আশা পূর্ণ হইল ও ধন্য হইলাম। বুঝিয়াছিলাম, এই দাসের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া ও আশীর্ব্বাদ আছে।

শ্রীভিক্ষুরাম ঘোষাল।

শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু

৭, কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

১৯১২ সালে ১৫ বৎসর বয়সের সময় আমার মাতৃ-বিয়োগ হয়। তাহার পর হইতেই আমার পিতার মনে সাংসারিক বিষয়ে ঔদাসীন্যের ভাব আসে এবং তিনি নানাস্থানে প্রকৃত সদ্‌গুরুর সন্ধান করিতে থাকেন। আমার মেজজ্যাঠা মহাশয়, আমার পিতা ও বাবু প্রকাশচন্দ্র ঘোষ এই তিনজন প্রায় একত্রই সাধু-সন্ধানে যাইতেন। এই সময়ে বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপ্যাধায় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া ভবানীপুরে বাস করিতে-ছিলেন। ক্রমে তাঁহার সহিত আমাদের পরিবারস্থ সকলের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে এবং তাঁহারই ভবানীপুরের বাসা বাটীতে ১৯১৪ সালে বাবা এবং মেজজ্যাঠা মহাশয় প্রথম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দর্শন করেন। রিক্ত হস্তে সাধুদর্শন অনুচিত বিবেচনা করিয়া দর্শন করিতে যাইবার সময় বাবা ও প্রকাশ বাবু আমাদের বাগান হইতে দুইটি গাঁদা ফুল লইয়া যান। ঐ দুইটি ফুলে গুরুদেব কটাক্ষপাত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ করিয়া দেন। বাটীতে তাঁহারা ঐ ফুল দুটি লইয়া আসিবার পরও এবং শুখাইয়া একেবারে নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে ঠিক সেইরূপ মিষ্ট গন্ধ ছিল। একটিতে খসখসের এবং অপরটিতে গোলাপ কিম্বা বেলের গন্ধ হইয়াছিল। তাঁহাদের মুখে গুরু-

দেবের সৌম্যভাব ও অপূর্ব্ব শ্রী-মণ্ডিত কান্তির কথা শুনিয়া মেজজ্যাঠা মহাশয় যাইলেন এবং তিনিও ফিরিয়া আসিয়া শতমুখে গুরুদেবের দিব্যভাবের কথা বলিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার ৩।৪ দিন পরে গোপাল বাবুর শ্বশুরবাটীতে বৈকালে আমি তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করি। প্রথম দর্শনে আমি তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চভাব পোষণ করিতে পারি নাই,—বরং জ্ঞানগঞ্জ ও চন্দ্রলোক সম্বন্ধে কিছু কিছু গল্প শুনিয়া মনে একটু অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাবই আসিয়াছিল। বাটী ফিরিয়া আমার সমবয়সী বন্ধুদিগের সহিত সেই মর্ম্মেই শ্লেষ ও বিদ্রূপসূচক আলোচনা করিতে থাকি। সেই সময় ঐরূপ করিবার কারণও ছিল।

প্রায় ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময় আমার মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হইয়াছিল এবং প্রথমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং তৎপরে বিবেকানন্দ স্বামীর বহি পড়িয়া মনে ধারণা হইয়াছিল যে, যোগ-বিভূতি একটা মস্ত ম্যাজিক ও "সিদ্ধাই", যাহারা দেখায় তাহা-দের মধ্যে ধর্ম্মভাব যদিও থাকে, লোকপ্রতিষ্ঠা এবং আত্ম-প্রাধান্যলাভেচ্ছাই তদপেক্ষা বেশী এবং যুবকগণের সেই সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সেই ভাবে অনু-প্রাণিত হইয়াই যোগবিভূতির কথা বিশেষ বিশ্বাসও করিতাম না এবং যাহারা করে বা দেখায় তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও হইত না।

যাহা হউক, ক্রমে আমার পিতা ও জ্যাঠামহাশয় শ্রীশ্রীগুরু-দেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের যত্ন ও ভক্তিতে

সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব কলিকাতায় আসিলেই প্রায় তিন চারি দিন করিয়া আমাদের বাটীতে কাটাইয়া যাইতেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অবস্থান-সময় বর্দ্ধিত করিয়া বৎসরে প্রায় দুই তিন মাস করিয়াও থাকিতেন। এইরূপ ভাবে প্রায় সাত আট বৎসর চলিয়াছিল।

তাঁহার অবস্থানকালে আমাদের পঠদ্দশায় তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। প্রথমে যে অশ্রদ্ধার ভাব ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে পরিণত হইল। প্রথমে অবিশ্বাসের ভাব থাকিলেও আমি কখনও শ্রদ্ধাহীন হইয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিতাম না, বরং যথাসাধ্য সত্যাসত্য বিচার করিতে চেষ্টা করিতাম। ফলে দেখিলাম যে যাঁহাকে আমি পূর্ব্বে বুজরুক মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার ন্যায় সত্যাশ্রয়ী জগতে বিরল এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কেন যোগবিভূতিকে ত্যাজ্য বলিয়া গিয়াছেন তাহাও বুঝিলাম। আমার এই সকল কথা বলিবার কারণ যে, আমি যে সকল স্বীয় অনুভূতি গ্রন্থকারের নির্ব্বন্ধাতিশয্য বশতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি তাহা এরূপ আশ্চর্য্য ও অনন্যসাধারণ যে শুনিলে লোকের মনে ভুল হওয়া সম্ভব যে আমি হয়ত কোন রূপে মোহাবিষ্ট ও একান্ত সরলভাবে এই সকল বিষয়ে বিশ্বাসী হইয়াছি।

আমি যে সকল অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছি সে গুলিকে সাধারণ ভাবে চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ১ম—ইচ্ছানুসারে নানাবিধ দ্রব্যাদি সৃষ্টি বা

আনয়ন এবং তাহার রূপান্তর করা। ২য়—স্বীয় শরীরের উপর নানারূপ ক্রিয়াকলাপ। ৩য়—অপরের শরীরের উপর ঐরূপ কার্য্য। ৪র্থ—সূক্ষ্ম শরীরে এবং সময় সময় স্থূল শরীরেই বহুদূর হইতে গমনাগমন ও সূক্ষ্মভাবে অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার।

প্রথম বিষয়ের বিভূতি অনেক শিষ্যই দেখিয়াছেন বলিয়া বিশেষভাবে উহার উল্লেখ না করিয়া মোটামুটি বলিতে চাই—প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকে থার্ম্মোমিটর, ঔষধের টেবলেট, জনায়ের মনোহরা, সন্দেশ প্রভৃতি হস্তপ্রসারণ মাত্র আনিতে দেখিয়াছি।

দ্বিতীয়টির মধ্যে নিজ শরীরের ভিতর পদ্মবীজ, টাকা, মোহর প্রভৃতি প্রবেশ করান, মস্তক হইতে শালগ্রাম শিলা বাহির করিয়া পুনরায় তাহা মস্তকে স্থাপন এবং শরীরের ভিতর হইতে দেহে রক্ষিত স্ফটিক বাহির করা—এই সকল অলৌকিক বিভূতি বহুবার বহুস্থানে দেখিয়াছি।

অপরের শরীরে স্ফটিক প্রবেশ করাইতে আমি তাঁহাকে দুইবার দেখিয়াছি। প্রথম ঘটনা ৺পুরীধামে হইয়াছিল—বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ১০।১১ বৎসরের কন্যার হস্তে। একদিন আহারাদির পর ক্ষেত্র বাবুর কন্যার ডান হাতে কনুয়ের উল্টা দিকে একটি স্ফটিক লইয়া অল্প চাপিয়া দিতেই তাহা স্বচ্ছন্দে চামড়া ভেদ করিয়া শরীরের ভিতর ধীরে ধীরে ঢুকিয়া গেল—কোনও রক্তপাত বা ক্ষতচিহ্ন রহিল না—কেবল-

মাত্র সেই স্থানে সামান্য একটু লালচে ভাব প্রায় আধ মিনিট কাল ছিল। তৎপরে তাহাও মিলাইয়া গেল। কেবল হাতের ভিতর যেখানে স্ফটিকটি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন সেই স্থানটি অল্প একটু উঁচা হইয়াছিল। আমরা সেই ফুলাটি টিপিয়া ঠেলিয়া দেওয়াতেই বেশ বুঝা গেল যে ভিতরকার জিনিষটি সরিয়া যাইতেছে। ক্রমে দেহের ফুলাভাবটি চলিয়া যাইলে পর শরীরের কোথায় সেই স্ফটিকটি আছে তাহা আর বুঝা যাইত না। তবে শ্রীশ্রীগুরুদেব মধ্যে মধ্যে সেই স্ফটিকটি কোথায় আছে দেখাইয়া দিতেন। ঐ জিনিষটি এখনও তাহার শরীরের ভিতর আছে এবং সে জন্য বা তাহার গতির জন্য ঐ বালিকার কোনও কষ্ট বা অস্বচ্ছন্দতা নাই। ঐরূপ বাবু বিধূভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের এক পুত্রের হাতেও একটি স্ফটিক ঢুকাইয়া দিতে দেখিয়াছি। সেটিও এখন তাহার শরীরে আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলেন যে, ঐভাবে স্ফটিক থাকাতে শরীরে হঠাৎ কোনও কঠিন পীড়া আসিতে পারে না এবং মানসিক বৃত্তিরও উন্নতি হয়।

বিনা কষ্টে বা রক্তপাতে কি করিয়া অপরের শরীরে কঠিন দ্রব্য ত্বগ্‌ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে, জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিলেন যে,—"জগতের সমুদায় বস্তুই সচ্ছিদ্র—কেবলমাত্র একের উপর এক, এবং তাহার উপর আর এক, সচ্ছিদ্র সূক্ষ্ম আবরণগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, দ্রব্যাদি কঠিন ও ছিদ্রহীন দেখায়। যে কেহ এই ঘনসন্নিবিষ্ট আবরণ-

গুলিকে শ্লথ করিতে পারিবে তাহার নিকট কাঠিন্য বা অবরোধ বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না।"

দ্রব্যাদির রূপান্তর সাধনের মধ্যে এক পুষ্পকে অন্য পুষ্পে পরিণত করা—এক সুগন্ধি পুষ্পকে নির্গন্ধ করিয়া অন্য পুষ্পে বা দ্রব্যে ঐ গন্ধের সঞ্চার করা, ১০৲ টাকার নোটকে ৫৲ টাকার নোটে পরিণত করা, একই টাকার উপরকার ছাপা বৎসরকে পরিবর্ত্তন করা, সুতার রুমালকে নানাবর্ণে চিত্রিত সিল্কের রুমালে পরিণত করা ইত্যাদি ব্যাপার বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই সকল রূপান্তর ইচ্ছাশক্তিতেও হইতে দেখিয়াছি এবং সূর্য্য-বিজ্ঞানের সাহায্যেও সাধিত হইতে দেখিয়াছি। উভয়ে প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানে একটু বিলম্ব হয়, আর ইচ্ছাশক্তিতে খুব শীঘ্র হয় এবং উহাতে কোনও রূপ যন্ত্রের সাহায্য দরকার হয় না। এতদ্ভিন্ন হস্তবিজ্ঞান বলিয়া এক অদ্ভুত বিজ্ঞানের সাহায্যেও এরূপ ঘটিতে দেখিয়াছি। তাহাতেও কোনওরূপ যন্ত্রসাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

আমি যখন এম্ এ ক্লাসে পড়ি, বোধ হয় ১৯১৭ কি ১৯১৮ সালে, আমাদের বাটীতে আমরা প্রথম সূর্য্যবিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রীশ্রীগুরুদেবকে সাধিতকরিতে দেখি আমার মনে সন্দেহ ছিল যে সূর্য্যবিজ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিতে বিশেষ প্রভেদ নাই। সেই সময় একদিন শ্রীশ্রীগুরুদেব এই দুইয়ের প্রভেদ বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া উদাহরণ স্বরূপ বলেন যে,—"এই পান আমি দিতেছি এবং আমি ইচ্ছা করি যে ইহাতে পদ্ম-গন্ধ হউক";

এই বলিয়া আমাকে পানটি দিলেন। দেখিলাম যে উহা অতি সুন্দর পদ্মগন্ধযুক্ত। তাহার কিছু পর অন্য কথা হইতে হইতে ডিবা হইতে আমাকে আর একটি পান দিলেন, দেখি যে সেটিও সেইরূপ পদ্মগন্ধযুক্ত। ইহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে ডিবাতে যতগুলি পান ছিল সবগুলিই পদ্মগন্ধযুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের ক্রিয়া এক সময় একটি দ্রব্যের উপরই হইতে পারে এবং তাহাতে যন্ত্রের ও কিছু সময়ের আবশ্যকতা হয়। ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া ইচ্ছামাত্রেই পরিণত হয়, যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না এবং বহু দ্রব্যের উপর উহা একই সময়ে সাধিত হইতে পারে।

গত বৎসর ৺কাশীধাম আসিবার পূর্ব্বে ভবানীপুর আশ্রমে অবস্থানকালীন শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাকে নানারূপ পশুর ছবি আঁকা রুমাল কুমারীদিগকে দিবার জন্য আনিতে বলেন। ঐরূপ কত রকমের রুমাল পাওয়া যায় বলিতে বলিতে তিনি একখানি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড লইয়া হাতের মুঠার ভিতর রাখিলেন এবং প্রায় অর্দ্ধমিনিট কাল পরে একখানি অতি সুদৃশ্য রুমাল মুঠা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—"এইরূপ রুমাল আনিতে পার ?" রুমালখানি বেগুনী রঙের সিল্কের এবং তাহার চারিকোণে ছোট ছোট সিংহ এবং মধ্যে একটি বড় সিংহ সুন্দরভাবে সোনার জলে ছাপা ছিল। অল্প সময় পরে রুমালটি পুনরায় ধীরে ধীরে সেই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হইল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কলিকাতার সমস্ত বাজার খুঁজিয়াও ঐরূপ একখানি রুমালও পাই নাই।

গত বৎসর শ্রীশ্রীগুরুদেব বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে ৺কামাখ্যায় যান। যাইবার পূর্ব্বে ৺কামাখ্যায় থাকার নানা অসুবিধার

কথা হইতেছিল। এমন সময় আমার কন্যা—তাহার বয়স তখন ৩ বৎসর—বলে,—"সেখানে চড়াই পাখীর মতন মশা আছে।" শ্রীশ্রীগুরুদেব হাসিয়া বলিলেন,—"দেখ দেখি, ৺কামাখ্যার মশা ইহা অপেক্ষা বড় কিনা।" এই বলিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালন করিয়া মুঠা খুলিয়া এক চামচিকা বাহির করিয়া আমার কন্যার হাতে দিলেন। সেটি জীবন্ত কিন্তু আচ্ছন্ন ভাবে ছিল; অল্পক্ষণ পরে বেশ সজাগ হইয়া চলিতে লাগিল।

গত বৎসর বোধ হয় আষাঢ় মাসেই একদিন সকালে হঠাৎ গুরুদেব আমাকে বলিলেন যে,—"কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন তোমাদের অফিসে তহবিল তছরূপ হইয়াছে এবং সেই অভিযোগে পুলিশ তোমাকে ধরিতে উপক্রম করিয়াছে। এমন সময় সকলে ব্যস্ত হইয়া আমাকে বলিল,-'বাবা! যতীশের বড় বিপদ; রক্ষা করুন।' আমি বলিলাম,—'কেন, তাহাদের বাটীতে শ্রীশ্রীগোপাল বসিয়া খালি কি সেবা মারিতেছে? যতীশকে কেন রক্ষা করিবে না?' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই গোপালজীউ মস্ত এক গদা হাতে করিয়া হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হইয়া যে সকল লোকে তোমার নামে মিথ্যা দোষারোপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে গদা প্রহার আরম্ভ করিলেন এবং দোষীদিগকে যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন।" এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীশ্রীগোপালজীউ আমাকে রক্ষা করিতেছেন জানিয়া মনে বড় আনন্দ বোধ করিলাম; কিন্তু অফিসের অধীনস্থ সকল কর্ম্মচারীদিগের সদ্ভাবে আমার

এতদূর আস্থা ছিল যে, এই ঘটনা যে কোন দিন সত্যে পরিণত হইতে পারে এই ধারণা আমার মনের কোণেও উদয় হইল না। পরে কিন্তু দেখা গেল যে সত্যই প্রায় ঐ সময় হইতে কতিপয় কেরাণী মিলিয়া এক ভীষণ প্রতারণা করিয়াছে এবং তাহার ফলে সুনাম বজায় রাখিয়া বাহির হইতে আমাকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুদেবের তাঁহার গুরুদেবের আদেশ অনুসারে ভবিষ্যৎ বিষয় প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বলিয়া, নানাভাবে তিনি নিজের শিষ্যদিগকে আগতপ্রায় বিপদ হইতে সাবধান করিবার জন্য সদা সচেস্ট থাকেন—তবে 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।' শিষ্যগণ সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার ইঙ্গিত ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেই অচিরাৎ বিপন্মুক্ত হয়।

আমার মেজ জ্যাঠা মহাশয়ের জীবদ্দশায় আমাদের বাটীতে একদিন রাত্রে কথায় কথায় গুরুদেব বলেন যে, তাঁহার মস্তকের ভিতর ২।৩টি শালগ্রাম শিলা ও একছড়া স্ফটিকের মালা আছে। দেখিতে চাহিলে, অল্প অল্প মাথা নাড়িয়া ভিতরে খুট্ খুট্ করিয়া শব্দ হইতেছে শুনাইলেন। ভাল বিশ্বাস হইল না বলিয়া দেখাইতে অনুরোধ করাতে তিনি পরদিন প্রাতে দেখাইতে স্বীকার করিলেন। রাত্রে দেখান সম্ভব নহে, কারণ শালগ্রাম বাহির করিলেই তাঁহার পূজা করিতে হইবে। পরদিন প্রাতে আহ্নিকের পর আমরা সকলে তাঁহার ঘরে যাইলাম এবং তিনি মাথা একটু নাড়িয়া অল্প একটু হেঁচকা দিয়া দম লওয়াতেই মুখ দিয়া প্রথমে একটি পরে আর একটি শিলা বাহির

হইল। পরে তাঁহাদের পূজা করিয়া আবার ঐ ভাবেই মাথার ভিতর তুলিয়া রাখিলেন।

আর একদিন প্রায় ঐ সময়েই তাঁহার ঘরের দ্বার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি নীচে সশরীরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ—প্রত্যহ সকালবেলা প্রায় আটটার সময় গুরুদেব আহ্নিকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দ্বিতলের ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে আসিয়া বসিতেন। আসিবার সময় একতালার একটি খোলা ছাদ পার হইয়া নীচে যাইবার সিঁড়ি দিয়া আসিতে হইত। আমরা সকলে প্রণাম করিবার জন্য সিঁড়ির নীচে একতালায় বসিয়া থাকিতাম। যেখানে বসিতাম সেই স্থান হইতে ঘরের দরজাগুলি স্পষ্ট দেখা যাইত। ঘটনার দিন আমরা যথানিয়ম নীচে বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি পশ্চাতে গুরুদেব সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছেন। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম এবং প্রণামান্তে উপরের ঘরে স্নানজল আনিতে গিয়া দেখি ঘরের সকল দরজাই ভিতর হইতে বন্ধ। গুরুদেব তখন নীচে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে বলাতেই তিনি বলিলেন,—"দেখ, এতক্ষণে খুলিয়াছে।" আমরা উপরে যাইতে যাইতেই খিল খোলার শব্দ জোরে শুনিতে পাইলাম এবং গিয়া দেখি ঘরের দরজার খিল সব খুলিয়া গিয়াছে।

ঝালদার রাজা উদ্ধবচন্দ্র সিংহ প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, এইরূপ ঘটনা গুরুদেব যখন ৮।৯ বৎসরের বালক ছিলেন তখন

একবার ঘটিয়াছিল। এই কথা রাজা উদ্ধব গুরুদেবের মাতার নিকট শুনিয়াছিলেন। দুষ্টামি করার নিমিত্ত জননী তাঁহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল দিয়া যান। বালকের ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য হঠাৎ প্রবল ইচ্ছা হইল এবং দরজার মধ্যে যে অল্প ফাঁক ছিল তাহার ভিতর দিয়া নিজের শরীর সঙ্কুচিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

নিজের শরীরের ভিতর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নাচে দিয়া পদ্মবীজ প্রবেশ করাইতে এই সময় প্রথম দেখি। বীজটি ঢুকাইয়া দিবার পর সেই স্থানে অল্প একটু লালচে ভাব কিছুক্ষণ ছিল, তৎপরে আর কোনও চিহ্ন ছিল না। বীজটি হাতের উপর দিয়া ঠেলিয়া বুকের কড়ার কাছে লইয়া আসিয়া মুখ দিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

এই সময়ে গুরুদেবের শরীরের উপর মশা মাছি বোল্‌তা প্রভৃতি বসিলে তৎক্ষণাৎ ঝল্‌সাইয়া মরিয়া যাইত। ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যে কীট যত জোরে দংশন করিত সেইটি তত শীঘ্র মরিয়া যাইত এবং পুড়িয়া তত কাল হইত, ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

তাঁহার গাত্রের অপূর্ব্ব মধুর গন্ধ যিনিই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া সে কথা আর বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলাম না। তবে এই টুকু হয়ত অনেকে জানেন না যে সিল্কের কাপড়, গেঞ্জি, আসন ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দেহস্থ তাড়িতের প্রভাবে ছেঁদা হইয়া, সুতা সরিয়া ৭।৮ দিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইত। আশ্চর্য্য,

এখন আর তত শীঘ্র নষ্ট হইতে দেখি না—গাত্রগন্ধও আর সব সময়ে তত তীব্রভাবে বহে না।

অশরীরিভাবে ভ্রমণের বা সঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপ মধ্যে মধ্যে মধুর পদ্মগন্ধ বা অন্য কোনও প্রকার মিষ্ট দিব্য গন্ধ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে গিরীন্দ্র বাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত ব্যবহারের প্রায় তিন বৎসর পরে নিজের ঐরূপ উপলব্ধির সৌভাগ্য হইয়াছিল। তখন আমি third year কি fourth year classএ পড়ি। একদিন সন্ধ্যার ঠিক প্রাক্কালে আমি আমাদের বাটীর দ্বিতলের ছাদে বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে হাওয়ার সহিত অতি তীব্র পদ্মগন্ধ ক্রমাগত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। আমার কোন ভুল হইয়াছে ভাবিয়া আমি বাটীর অপরাপর অনেককে ডাকিলাম—তাঁহারাও সকলে সেই গন্ধ পাইলেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই গন্ধ আমাদের সমস্ত বাটীতে ছড়াইয়া পড়িল। সেই দিনের পর হইতে বাটীতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ঐরূপ গন্ধ পাওয়া যাইত—বিশেষতঃ যখনই কোনও গভীর বিষয়ের আলোচনা হইত তখনই প্রায় ঐরূপ গন্ধ অনুভূত হইত। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি প্রায়ই যাইয়া থাকি এবং তোমরা কি করিতেছ লক্ষ্য করি।" বৈকালে যে দিন প্রথম গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল সে দিন তিনি প্রথমে খিদিরপুর গিয়াছিলেন ও তৎপরে আমাদের বাটীতে আসেন, এই কথা বলিয়াছিলেন। খিদিরপুর সত্যই আমাদের বাটীর দক্ষিণপশ্চিম কোণে অবস্থিত।

এই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে যে ঘরে গুরুদেব আমাদের বাটীতে অবস্থানকালীন থাকিতেন সেই ঘরে আমি যখন ধূপ-ধুনা দিতেছিলাম তখন হঠাৎ মনে হইল অপর একজন লোক সেই ঘরে আছেন। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি যে প্রায় চারি হাত দূরে বিশাল-বপু তুষার-শুভ্র এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—তাঁহার গাত্রচর্ম্ম এত মসৃণ যে দেখিলেই মনে হয় যেন সদ্যঃ তৈলসিক্ত। দেখিয়াই আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই সেই মূর্ত্তি হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন। গুরুদেবকে মূর্ত্তির বিবরণ দেওয়াতে তিনি তাঁহাকে তাঁহার গুরুভ্রাতা মহাযোগী শ্রীমৎ নিমানন্দ পরমহংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

ক্রমে তাঁহার আবির্ভাবের সময় যে কেবল সদ্‌গন্ধই বাহির হইত তাহা নহে, তাঁহার মুর্ত্তিরও উদয় হইত—এমন কি শেষকালে গন্ধের বিকাশ ব্যতীত কেবল মূর্ত্তিরই সাক্ষাৎকার পাইয়া তাঁহার আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিতাম এবং সেই সময়ে মনেও একটা বিশেষ শান্ত স্থির ভাবের উদয় হইত। তাঁহার সঞ্চারের মধ্যে একটি বিশেষ ক্রম দেখি। প্রথমে গন্ধ, পরে কঠিন বস্তুতে আঘাতজনিত শব্দ, তাহার পরে তাড়িতের শব্দ ও বিদ্যুন্মালার ন্যায় আলোক এবং সর্ব্বশেষে কেবল মাত্র মূর্ত্তির উদয়।

প্রথম প্রথম সুগন্ধ দ্বারা তাঁহার আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিতাম। পরে হঠাৎ কাষ্ঠে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ শুনিয়া মন সতর্ক হইত। তৎপরে হঠাৎ চক্ষুর

সম্মুখে আলোক মালা প্রকাশ করিয়া মনকে সেই দিকে আকৃষ্ট করতঃ স্বকীয় মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট প্রতীয়মান করাইয়া তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা জানাইতেন এবং মন যখন স্বাভাবিকই স্থির শান্ত ভাবে থাকে এবং কোনওরূপ বাহ্যভাব প্রকাশ করিয়া তাহাকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়োজন না থাকে, তখন কেবলমাত্র তাঁহার শুদ্ধ রূপই সুস্পষ্ট জাগিয়া উঠে। বহুদূরে থাকিয়াও যে তিনি আমাদের অতি নিকটে থাকিয়া সদা বিপদ হইতে রক্ষা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, এই কথা জানিয়া মনে বল ও আশা উদিত হয়। আমি যাহা লিখিতেছি তাহা আমার অনুভূতি হইতেই লিখিতেছি।

আমি যখন sixth year classএ পড়ি সেই সময় একদিন সকালে গুরুদেবের ঘরে বসিয়া ভগবৎ চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে সেই ঘরে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তাঁহার গাত্রস্থ মধুর গন্ধ ও সেই সময়ে স্বীয় শরীরের রোমাঞ্চ অনুভব করিবার ঠিক পরেই ঘরের দরজার বাহির হইতে ছিটকানি বন্ধের শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমিও সেই সময় আহ্নিক শেষ করিয়া বাহিরে আসিবার জন্য ঘরের ভিতরের খিল খুলিলাম। তখন বাহির হইতে গুরুদেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, স্পষ্ট শুনিলাম— "বাহিরে আসিবার সময় আমার পা লাগিয়া ছিটকানি পড়িয়া দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে—তুমি পিছনের দরজার খিল খুলিয়া বাহিরে আইস।" আমি তাহাই করিলাম এবং যদিও অপর কাহারও সেই ঘরে তখন আসিবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি

বাটীস্থ সকলকে কেহ গুরুদেবের পার্শ্বের ঘরে গিয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। সকলেই অস্বীকার করিল। বিশেষতঃ আমার পিতা তখন গুরুদেবের পার্শ্বের ঘরের পরের ঘরে অসুস্থ হইয়া শুইয়াছিলেন এবং কেহ গুরুদেবের পার্শ্বের ঘরে আসিলে তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া আসা সম্ভব ছিল না। তিনিও বলিলেন, তিনি কাহাকেও ঐ ঘরে আসিতে বা গুরুদেবের ঘরের দরজায় হাত দিতে দেখেন নাই।

এই রকমের আর একটি ঘটনা এই বৎসর গ্রীষ্মকালে গুরুদেব যখন ভবানীপুরের আশ্রমে ছিলেন তখন ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি এইরূপ—

এই সময় আমি প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আশ্রমে আসিয়া গ্রামোফোন বাজাইতাম। একদিন কোনও কারণে দ্বিপ্রহরে আফিস যাওয়ায় গ্রামোফোন বাজাইতে আশ্রমে আসিতে পারি নাই—কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিতে প্রায় ১॥০টা বাজিয়া গেল দেখিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য আমাদের নীচের বৈঠকখানায় শুইয়া রহিলাম--ইচ্ছা যে ১৫।২০ মিনিট বিশ্রামের পর আশ্রমে যাইব। ৮।১০ মিনিট এই ভাবে থাকিবার পরই শুনিলাম, কে আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে এবং বলিতেছে, "দুইটা বাজিতে চলিল, কখন গ্রামোফোন বাজাইতে আসিবে ?" কথার ধরণে বেশ বুঝিলাম যে গুরুদেবই বলিতেছেন, কিন্তু তাঁহার স্বরের সহিত কথার স্বরে পার্থক্য রহিয়াছে। যাহা হউক, আমি আশ্রমে গিয়া প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ অন্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিলাম, পরে

আমাকে গ্রামোফোন বাজাইতে বলিলেন। আমি বাজাইতে লাগিলাম। কিন্তু দ্বিপ্রহরের ঘটনার কথা কিছুই উল্লেখ করিলাম না। কিয়ৎকাল বাজানের পর গুরুদেব পার্শ্বের ঘরে উঠিয়া যাইলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই সেই ঘর হইতে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি শব্দ শুনিয়াই চমৎকৃত হইলাম। যে স্বর আজ বাটীতে ক্ষণকাল পূর্ব্বে শুনিয়া আসিয়াছি ইহা অবিকল সেই স্বর। আমি পার্শ্বের ঘরে গুরুদেবের নিকট যাইয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলায় তিনি বলিলেন,—"তুমি আর একটু ঐ ভাবে শুইয়া থাকিলে ঘুমাইয়া পড়িতে বলিয়া তোমাকে ডাকিয়া সজাগ করিয়া দিয়াছিলাম।"

১৯১৮ সালের শেষভাগে কিম্বা ১৯১৯ সালের প্রারম্ভে শীতকালে গুরুদেব আমাদের বাটীতে অবস্থানকালে সহসা তাঁহার মাতৃবিয়োগের তার আসাতে তিনি বাটী হইতে বগুল গ্রামে চলিয়া যান। চলিয়া যাইবার ৪।৫ দিন পরে আর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেটি এইরূপ :—

আমার উপরের শুইবার ঘরে আসিতে হইলে সিঁড়ি উঠিয়া একটা লম্বা দালান পার হইয়া যাইতে হয়। আমি একদিন রাত্রে শুইতে ঘরে আসিতেছি; সিঁড়ি পার হইয়া দালানে উঠিতে আর প্রায় ৩।৪টি ধাপ বাকি আছে। এমন সময় দেখি সাদা কাপড় গায় দিয়া একজন লোক আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া দালান পার হইয়া সিঁড়ির দিকে আসিতেছে। দালান এবং সিঁড়িতে কোনও আলো ছিল না—দূরের আলোয় অল্প

একটু চক্‌চকে দেখাইতেছিল। সাদা কাপড় পরা মূর্ত্তিটিকে আমি আমার চাকর 'লক্ষ্মণ' বলিয়া মনে করিলাম—মূর্ত্তিটি যখন প্রায় আমার নিকট হইতে ৪।৫ হাত দূরে তখন আমি 'কে রে, লক্ষ্মণ' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এবং সে উত্তর দিবে আশা করিলাম। মূর্ত্তিটি কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া যেমন ধীরভাবে আসিতেছিল তেমনই ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং আমাকে পাশ কাটাইয়া সিঁড়ি দিয়া দ্রুত নামিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। যখন আমাকে পাশ কাটাইতেছে, তখন দেখিলাম আর কেহ নহে, উহা স্বয়ং গুরুদেব। দেখিবামাত্রই মন ভয় ও আনন্দে এমন অভিভূত হইয়া গেল যে আমার আর পশ্চাদ্‌গামী হওয়া হইল না—ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাতে এই ঘটনার কথা বাটীতে বলিতে গিয়া শুনিলাম যে আমার পিতা প্রায় সেই সময় আহ্নিক শেষ করিয়া যখন নীচের ঘরে গুরুদেবের ছবিকে প্রণাম করিতেছিলেন তখন ঐ ছবির পার্শ্বে যে দরজাটি খোলা ছিল সেই দরজার ধারে গুরুদেবকে শাদা কাপড় গায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। গুরুদেবকে এ বিষয়ে পরে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি গলার কাছা গায়ে জড়াইয়া ছিলেন বলিয়া ঐ ভাবে শ্বেতবস্ত্রাবৃত দেখিতে পাইয়াছিলাম।

১৯২০ সালে বৈশাখ মাসে আমার বিবাহের সময় গুরুদেব এঁড়িয়াদহের বাগান বাটীতে থাকিতেন। তিনি যেখানে যতদূরে থাকুন না কেন এই অধীনের জীবনের সকল গুরুতর ব্যাপা-

য়েই তিনি উপস্থিত থাকেন, এ বিষয়ে আমি ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি। কেবল মাত্র আমিই যে তাঁহার কৃপাপাত্র তাহা নহে—সকল শিষ্যই সমভাবে তাঁহার স্নেহপাত্র, তবে তাঁহার উপস্থিতি কেহ কেহ অনুভব করিতে পারেন. কেহ বা সেই সময় অপেক্ষাকৃত মানসিক ধীরতার অভাবে তাহা পারেন না।

আমার মামীমার এক ভাগিনেয়ীর সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। স্ত্রী-আচারের সময় কয় পাক ঘোরান হইল. এই লইয়া মামীমার সহিত উপস্থিত অপর স্ত্রীলোকদের মত-বিরোধ হয়। বিবাহের পর গুরুদেবের সহিত সাক্ষাতের সময় যখন আমি বলিলাম,—"গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে আপনার আসনকে প্রণাম করিবার সময় আপনি আসিয়াছিলেন বুঝিতে পারিয়া ছিলাম", তখন তিনি বলিলেন,—"তোমার বিবাহের দিন আমি তিনবার গিয়াছিলাম। কেন, স্ত্রী আচারের সময় যখন তোমার মামীমা কয়বার ঘোরান হইল বলিয়া গণ্ডগোল করিতেছিলেন, তখন আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া—তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই ?" আমি অবশ্য তাহা পারি নাই।

বিবাহের পর সস্ত্রীক কোনও এক কুটুম্বের বাটী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় আমার পিতা আমার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গুরুদেব তখন কলিকাতায় ছিলেন না। কিছুদিন পরে যখন আমাদের বাটীতে আগমন করেন তখন কথাপ্রসঙ্গে সেই রাত্রের ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমার সেই সময়ের ব্যবহারের প্রশংসা করেন। ঐ

ব্যাপার তিনি কি করিয়া জানিলেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—"সেই সময় আমি তোমাদের বাটী গিয়াছিলাম—যোগেশ খুব রাগিয়াছে দেখিয়া ভাবিলাম তুমি কিরূপ ব্যবহার কর দেখিয়া যাইব। তোমাদের যখন কথাবার্ত্তা হইতেছিল তখন আমি তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলাম।"

১৯২০ সালে বিবাহের পর জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি ৺পুরীতে দিন কতক আশ্রমে ছিলাম। ঐ বাটীর মধ্যে একটি হল ঘর এবং দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট ছোট ঘর ছিল। তন্মধ্যে বাম দিকের ঘরে গুরুদেব থাকিতেন। হল ঘর এবং গুরুদেবের ঘরের মধ্যে একটি দরজা—তাহা গুরুদেবের ঘরের দিক হইতে সব সময়ই বন্ধ থাকিত। একদিন রাত্রে প্রায় ১২টা আন্দাজ আমার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং মধ্যে বদ্ধ দ্বার থাকা সত্ত্বেও আমি গুরুদেবের ঘরের ভিতর বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, তাঁহার ঘরটি অতি স্নিগ্ধ মৃদু জ্যোৎস্নার ন্যায় এক আলোকে প্লাবিত এবং তিনি পদ্মাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহ সচরাচর অপেক্ষা অধিক স্ফীত এবং সম্পূর্ণ দুগ্ধ-শুভ্র—কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি সবই তুষারধবল। তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব সৌম্যভাব এবং সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ বদনমণ্ডল, অতি সুগঠিত; অথচ তিনিই যে আমাদের গুরুদেব শ্রীমদ্‌বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তখনকার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল, উন্নত ললাট, অতি সুগঠিত নাসা ও মস্তকের সহিত আমরা সচরাচর যাহা

দেখি তাহার অনেক প্রভেদ। অল্প পরেই আবার আমার চক্ষুর সম্মুখে কে যেন আবরণ টানিয়া দিল—দেখি যে প্রাচীর সেই প্রাচীর, যে দ্বার সেই দ্বার। পরদিন প্রাতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ক্রিয়ার সময় আপনার শরীরের কিছু পরিবর্ত্তন হয় কি ?" তিনি বলিলেন,—"হাঁ, একেবারে সাদা হইয়া যায় এবং দেখিতে অতি সুন্দর হয়।"

আমার বিবাহের পরদিনই আমার খুল্লতাত পুত্র অরুণচন্দ্র বসুর ফুলশয্যা ছিল। সেই ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যা হইতে নবোঢ়া কন্যা হঠাৎ বিষম শূল যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পড়েন। সেই কারণে বাটীস্থ সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। রাত্রি প্রায় ৭৷৷০টা আন্দাজ আমি (আমারও মন ঐ কারণে একটু খারাপ হইয়াছিল) আমাদের একতলার বৈঠকখানায় টেবিলে মাথা দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম—ঘরে তখন ২।৩ জন অন্য লোকও ছিলেন। হঠাৎ স্পষ্ট অনুভব করিলাম যে গুরুদেব আসিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মূর্ত্তি মানসচক্ষে উজ্জ্বল-ভাবে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিয়াই আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে (মনে মনেই) বলিলাম,—"অরুণের আজ ফুলশয্যার দিন, অথচ কন্যা যন্ত্রণায় মূর্চ্ছান্বিতা।" এই কথা বলিবামাত্রই চক্ষুর সম্মুখে যে ঘরে কন্যা ছিলেন সেই ঘরটি ছায়াচিত্রের ছবির ন্যায় জাগিয়া উঠিল এবং দেখিলাম যে গুরুদেব তর্জ্জনীর দ্বারা পেটের এক জায়গায় ছুঁইয়া অঙ্গুলিটি একটু একটু কাঁপাইতে লাগিলেন। ২।৪ সেকেণ্ড পরেই স্পষ্ট মনে হইল তিনি যেন

বলিলেন,—"ফুলশয্যার কখনও ব্যাঘাত হইবে না—রাত্রি ৯।১০টা আন্দাজ কন্যা সুস্থ হইবে"। তাহাই ঘটিয়াছিল।

বিবাহের প্রায় ২।১ মাস পরে আমি দিনকতক আমার মাতুলালয়ে সস্ত্রীক ছিলাম। একদিন রাত্রে মাতুলের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত যখন ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রের pan-psychismএর আলোচনা করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ চক্ষুর সম্মুখে গুরুদেবের মূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে ভাসিয়া উঠিল—এবং পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম যে তিনি একেবারে দ্বিতলের বারেণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন। সমস্ত বারাণ্ডাটি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—দেখিলাম সেখানে আমার স্ত্রী ও মাসীমা ভিন্ন অপর দুইটি মাসীমার মহিলাবন্ধু বসিয়া আছেন। গুরুদেব যেন আমার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমার মাতুলের পুত্রকে এই ঘটনার কথা বলিয়া ঐ চারিজন স্ত্রীলোককে কোন্ মুখ করিয়া বসিয়া আছেন বলিয়া দিয়া, আমার অনুভূতির সত্যতা পরীক্ষার্থে তাহাকে উপরে গিয়া দেখিয়া আসিতে বলিলাম। আমি যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম চারিজনই ঠিক সেই ভাবে বসিয়াছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে আমার কোন কৃতিত্ব দেখি না। এই ধরণের অনুভূতি সকল ঠিক কিনা এবং গুরুদেব বহুদূরে থাকিয়াও ঐশী শক্তি সাহায্যে সত্য সত্যই ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারেন কিনা, এই বিষয় লইয়া আমার মনে প্রায়ই সন্দেহ হইত এবং তাঁহাকে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতাম। বোধ হয় আমার সন্দেহ ভঞ্জনার্থে কৃপা করিয়া তিনি ঐ ভাবে প্রমাণ রাখিয়া যাইতেন।

এই সময় আমাদের বাটীতে অবস্থানকালীন গুরুদেব উপদেশ চ্ছলে একদিন বলেন যে আধার প্রস্তুত করাই সর্ব্বাগ্রে বিশেষ আবশ্যক। আমি একলা আমাদের নীচের ঘরে বসিয়া ঐ কথারই মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় গুরুদেব যেন আমার মনের ভিতর বলিলেন,—"আধার ত্রিবিধ—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। আসনাদি দ্বারা শারীরিক, ওতপ্রোতভাবে কার্য্য করিতে চেষ্টার দ্বারা মানসিক, ও জপাদি ক্রিয়া দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।" এরূপ অল্পের মধ্যে ও এরূপ সরলভাবে বলিলেন যে; আমার বুঝিতে আর কোন গোল রহিল না। এ কথা তাঁহাকে পরে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন,—"তুমি বিষয়টি লইয়া ভাবিতেছ দেখিয়া এবং তোমার পক্ষে উহা জানা প্রয়োজনীয় মনে করিয়া, তোমাকে জানাইয়া দিলাম।"

এইরূপ বহুদূরে থাকিয়াও অশরীরিভাবে ভ্রমণের আমি ভূরি ভূরি নিদর্শন পাইয়াছি এবং যথাসাধ্য সত্যাসত্যের বিচার করিয়া গুরুদেবের যে নিমেষ মাত্রেই বহুদূর বিচরণ করিবার ক্ষমতা আছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। এই সকল অনুভূতি সব সময় স্পর্শেন্দ্রিয়-জনিত নয় বলিয়া ইহাদের মূল্য অল্প নহে। কল্পনায় নিজের চেষ্টার প্রয়োজন, কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে মন গুরুদেবের বিষয় চিন্তা করে না অথচ হঠাৎ তাঁহার মূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে এবং পাছে অন্য চিন্তায় রত থাকিয়া এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয়গুলি ধারণা

বলিলেন,—"ফুলশয্যার কখনও ব্যাঘাত হইবে না—রাত্রি ৯।১০টা আন্দাজ কন্যা সুস্থ হইবে"। তাহাই ঘটিয়াছিল।

বিবাহের প্রায় ২।১ মাস পরে আমি দিনকতক আমার মাতুলালয়ে সস্ত্রীক ছিলাম। একদিন রাত্রে মাতুলের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত যখন ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রের pan-psychismএর আলোচনা করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ চক্ষুর সম্মুখে গুরুদেবের মূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে ভাসিয়া উঠিল—এবং পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম যে তিনি একেবারে দ্বিতলের বারেণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন। সমস্ত বারাণ্ডাটি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—দেখিলাম সেখানে আমার স্ত্রী ও মাসীমা ভিন্ন অপর দুইটি মাসীমার মহিলাবন্ধু বসিয়া আছেন। গুরুদেব যেন আমার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমার মাতুলের পুত্রকে এই ঘটনার কথা বলিয়া ঐ চারিজন স্ত্রীলোককে কোন্ মুখ করিয়া বসিয়া আছেন বলিয়া দিয়া, আমার অনুভূতির সত্যতা পরীক্ষার্থে তাহাকে উপরে গিয়া দেখিয়া আসিতে বলিলাম। আমি যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম চারিজনই ঠিক সেই ভাবে বসিয়াছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে আমার কোন কৃতিত্ব দেখি না। এই ধরণের অনুভূতি সকল ঠিক কিনা এবং গুরুদেব বহুদূরে থাকিয়াও ঐশী শক্তি সাহায্যে সত্য সত্যই ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারেন কিনা, এই বিষয় লইয়া আমার মনে প্রায়ই সন্দেহ হইত এবং তাঁহাকে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতাম। বোধ হয় আমার সন্দেহ ভঞ্জনার্থে কৃপা করিয়া তিনি ঐ ভাবে প্রমাণ রাখিয়া যাইতেন।

এই সময় আমাদের বাটীতে অবস্থানকালীন গুরুদেব উপদেশ চ্ছলে একদিন বলেন যে আধার প্রস্তুত করাই সর্ব্বাগ্রে বিশেষ আবশ্যক। আমি একলা আমাদের নীচের ঘরে বসিয়া ঐ কথারই মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় গুরুদেব যেন আমার মনের ভিতর বলিলেন,—"আধার ত্রিবিধ—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। আসনাদি দ্বারা শারীরিক, ওতপ্রোতভাবে কার্য্য করিতে চেষ্টার দ্বারা মানসিক, ও জপাদি ক্রিয়া দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।" এরূপ অল্পের মধ্যে ও এরূপ সরলভাবে বলিলেন যে; আমার বুঝিতে আর কোন গোল রহিল না। এ কথা তাঁহাকে পরে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন,—"তুমি বিষয়টি লইয়া ভাবিতেছ দেখিয়া এবং তোমার পক্ষে উহা জানা প্রয়োজনীয় মনে করিয়া, তোমাকে জানাইয়া দিলাম।"

এইরূপ বহুদূরে থাকিয়াও অশরীরিভাবে ভ্রমণের আমি ভূরি ভূরি নিদর্শন পাইয়াছি এবং যথাসাধ্য সত্যাসত্যের বিচার করিয়া গুরুদেবের যে নিমেষ মাত্রেই বহুদূর বিচরণ করিবার ক্ষমতা আছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। এই সকল অনুভূতি সব সময় স্পর্শেন্দ্রিয়-জনিত নয় বলিয়া ইহাদের মূল্য অল্প নহে। কল্পনায় নিজের চেষ্টার প্রয়োজন, কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে মন গুরুদেবের বিষয় চিন্তা করে না অথচ হঠাৎ তাঁহার মূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে এবং পাছে অন্য চিন্তায় রত থাকিয়া এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয়গুলি ধারণা

করিতে না পারা যায়, এইজন্য হঠাৎ কোনওরূপ শব্দ, গন্ধ বা আলোক প্রকাশ দ্বারা মনকে আকৃষ্ট করা হয়—বিশেষতঃ যখন সেই সময়কার কথাবার্ত্তা বা উপদেশের বাহ্য জগতের সহিত ঠিক মিল রহিয়াছে। এই সকল অনুভূতি যে মিথ্যা নহে তাহার অন্য প্রধানতম কারণ গুরুদেবের নিজের স্বীকারোক্তি। Hallucination তখনই মিথ্যা বহির্জগতে যখন তাহার মিল পাওয়া যায় না। কিন্তু যে hallucination এর সহিত বাহ্য বস্তুর মিল রহিয়াছে তাহাকে আর hallucination বলা চলে না। এখন এইরূপ hallucination এর কারণ এক নিজের ভিতর হইতে আসিতে পারে বা বাহির হইতে আসিতে পারে। কারণ যদি সত্য হয় তবেই ফল সত্য হইবে। সত্য ফল কখনও accident ভিন্ন ভুল কারণ প্রসূত হইতে পারে না। বাহ্য জগতের সহিত মিল রহিয়াছে বলিয়া আমার অনুভূতি সত্য এবং সত্য অনুভূতির কারণ কখনই সদা-চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল দেহাভ্যন্তরীন ক্রিয়া হইতে পারে না।

আমাদের বাটীতে ৺পুরীর আশ্রমে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীগোপাল জীউর পাদপদ্ম রক্ষিত ছিল। তাঁহার নিত্য পূজা ও সেবা হইত। বিগ্রহকে ভোগ দিলে সত্য সত্যই প্রসাদ-চিহ্ন পাওয়া যায় কি না, এই লইয়া একদিন আলোচনা হইতেছিল। গুরুদেব তাহাতে বলিলেন,—"আচ্ছা, তোমরা একদিন শ্রীশ্রীগোপালের বিশেষ শুদ্ধভাবে ভোগের আয়োজন কর, প্রসাদ-চিহ্ন

তোমাদের দেখাইব।" পরদিন এক থালা সন্দেশ ঘরে তৈয়ার করিয়া শ্রীশ্রীগোপালকে ভোগ দেওয়া হইল—গুরুদেব ভোগ দিয়া দিলেন। প্রসাদ আনিতে যাইয়া আমি দেখিলাম একটি সন্দেশের আধখানি কে ভাঙ্গিয়া লইয়াছে এবং অবশিষ্ট সন্দেশে ছোট ছোট অঙ্গুলিস্পর্শের চিহ্ন রহিয়াছে। আমি আসিয়া গুরুদেবকে সেই কথা বলায় তিনি বলিলেন,—"কেন, একটি পুরা সন্দেশ খাইবার কথা।" পুনরায় ফিরিয়া গিয়া দেখি সেই অর্দ্ধ সন্দেশ ব্যতীত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে আর একটি সন্দেশ কেহ তুলিয়া লইয়াছে—সন্দেশ নাই অথচ সেখানে সন্দেশের দাগ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উপস্থিত বহু গুরুভ্রাতা সকলেই সেই চিহ্ন দেখিয়াছিলেন এবং সকলে মহানন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আমার বাবা প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে হার্ণিয়া কাটাইবার জন্য এক নর্সিং হোমে ছিলেন। সে সময় গুরুদেব প্রায়ই তথায় যাইয়া বাবাকে দেখিয়া আসিতেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ তিনি নর্সিং হোমের প্লানটি সুন্দর ভাবে সকলকে বলিয়াছিলেন এবং কোন নর্স কিরূপ দেখিতে ও বাবার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে তাহা সব যথাযথ বলিয়া দিয়াছিলেন।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে ভবানীপুরে থাকার সময় একদিন সকালে হঠাৎ বলিলেন,—"একটি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এইস্থান দিয়া যাইতেছেন—তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে কিছু দিতে চাহেন।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি হস্ত প্রসারণ

করিলেন এবং ঠিক যেন শূন্য হইতে কে একটি সুন্দর অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত জবা ফুল গুরুদেবের হস্তে ফেলিয়া দিলেন। সেই ফুলটি এখনও আমার কাছে আছে—শুখাইয়া যাইলেও এতদিন পরেও তাহার পাপড়ীগুলি ভঙ্গুর হয় নাই।

এই বৎসর ৺পুরীতে থাকিবার সময় একদিন বায়ুক্রিয়ায় কিরূপে দেহ স্ফীত করা যায় বলিতে বলিতে তাঁহার হাতের তর্জ্জনীটি প্রায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফুলাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"ইহাকে আরও এত স্ফীত করা যায় যে তোমরা দেখিলে মূর্চ্ছিত হইয়া যাইবে।" আবার খানিক সময় পরে অঙ্গুলি সমভাব প্রাপ্ত হইল। আশ্চর্য্য এই যে এই প্রক্রিয়ার সময়ও তিনি যেমন কথা বলিতেছিলেন তেমনই বলিতে লাগিলেন—বিশেষ চেষ্টার ভাব কিছুমাত্র দেখিলাম না।

গত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রার সময় একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি এইরূপ :—

গুরুদেব সমভিব্যহারে আমরা অনেকে রথ-যাত্রার দিন যে রাস্তা দিয়া রথ যায় সেই রাস্তায় এক বট বৃক্ষতলে বসিয়াছিলাম। সকলেই বসিয়াছিলেন, কেবল আমি অগ্রগামী হইয়া রথ আসিতে কত দেরী আছে দেখিতে গিয়াছিলাম। যখন সুভদ্রার রথ আমার নিকট হইতে ২৫।৩০ হাত দূর, তখন দেখিলাম যে গুরুদেব রথের চারিদিকে যেখানে দড়ি ঘেরা থাকে এবং জনতাকে যাইতে দেওয়া হয় না, সেইখান দিয়া রথের দিকে যাইতেছেন—যে কাপড় জামা পরিয়া রথ দেখিতে আসিয়া-

ছিলেন তাহাই পরা—হাওয়ায় পাঞ্জাবী উড়িতেছে। আমি প্রথমে মনে করিলাম যে ঐ রথের চার্জ্জে আমাদের গুরুভ্রাতা পুলিস ইন্সপেক্টর অক্ষয় বাবু আছেন বলিয়া গুরুদেবকে বিশেষ করিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং আশা করিতেছিলাম যে এখনই অপরাপর গুরুভ্রাতাদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী দেখিতে পাইব। মনে করিয়া একটু ক্ষোভের সঞ্চারও হইল—আহা গুরুদেবের সঙ্গে থাকিলে আমিও ভিতরে যাইতে পারিতাম। এইরূপ মনে হইতে হইতেই গুরুদেব রথের সম্মুখীন হইলেন এবং বিনা অবলম্বনে সাবলীল গতিতে রথের উপরে উঠিয়া যাইলেন—রথারোহণের ভঙ্গীতেই বুঝিলাম যে তিনি সাধারণ ভাবে আসেন নাই। রথের উপর তিনি ৫।৬ সেকেণ্ড থাকিয়া পূজাদি কিছু করিতেছেন বলিয়া মনে হইল। তৎপরেই ঝম্প প্রদান করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া জনতার মধ্যে মিলাইয়া যাইলেন। আমিও দ্রুত বটবৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তিনি যেমন চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন সেইরূপই করিতেছেন এবং যাইবামাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রথ আসিতে কত দেরী ?" আমি বলিলাম,—"এতক্ষণ পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন ?" তিনি বলিলেন,—"তোমাকে একটু ম্যাজিক দেখাইলাম।" (এইরূপ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন, ঠিক ঐ কথা বলেন নাই।)

৺সাক্ষিগোপাল দেখিতে গিয়াও মন্দিরে ঐরূপ হইয়াছিল। সকলে দর্শন করিয়া ফিরিবার পরও আমি বিগ্রহের সম্মুখে

দাঁড়াইয়াছিলাম এবং গুরুদেবকে আসিয়া বিগ্রহের গলায় মালা দিতে দেখিয়াছিলাম অথচ মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি তিনি অপর শিষ্যগণের সহিত কত প্রসাদ লইতে হইবে তাহার আলোচনায় ব্যস্ত। স্থূল শরীরে এক কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সচরাচর অপ্রত্যক্ষ ভাবে কিরূপে অন্যত্র অন্য কার্য্য করা যায় এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন,—"তাহা আর শক্ত কি ?"

আমার অনুভূতি ঠিক কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি মধ্যে মধ্যে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতাম তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

এই বৎসর ভবানীপুর আশ্রমে গুরুদেব যে ঘরে বসিতেন, সেই ঘরে নয় অপর একটি ঘরে আমি মাটিতে শুইয়াছিলাম—হঠাৎ গুরুদেবের আবির্ভাব হইল। আমি মূর্ত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম,—"আজ আমার কন্যা টুনু আসিবার সময় আপনার নিকট হইতে ছেঁচা পান লইয়া যাইবে বলিয়াছে; আমি কিছুই বলিব না। যদি আপনি এখন সত্যই আসিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি না চাওয়া সত্ত্বেও আপনি আমাকে ছেঁচা পান দিবেন।" বলিতে বলিতেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। আমি নিজে কখনই ছেঁচা পান খাই না এবং মোটেই খাইতে ভালবাসি না বলিয়া গুরুদেবও আমাকে কখনও ছেঁচা পান দেন না।

যাহা হউক, ক্ষণপরে গুরুদেবের ঘরে তাঁহার নিকট গিয়া বসিলাম—তিনি সাদা পান দিলেন, সাধারণ কথাবার্ত্তা হইতে

লাগিল আমার মন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি স্থির জানি গুরুদেব আসিয়াছিলেন অথচ পরীক্ষার সমাধান হইল না। যখন প্রণাম করিয়া উঠিতেছি তখন হাসিতে হাসিতে কৌটা হইতে ছেচা পান লইয়া বলিলেন,---"কি গো, মেয়ের জন্য পান লইবে না ?" আমিও আনন্দে হাসিয়া উঠিলাম এবং সমস্ত ব্যাপার উপস্থিত সকলকে বলিয়া পান লইয়া চলিয়া আসিলাম।

গত বৎসর ভবানীপুর আশ্রমে বর্ষাকালে একটি নূতন প্রকারের ব্যাপার ঘটিয়াছিল। 'ভূতেশ্বর' এই কথাটির সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত ইহা হইতে দেখা যাইবে। একদিন বেলা ২।৩টা আন্দাজ খুব মেঘ ডাকিতেছিল ও বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল, এমন সময় গুরুদেব আসন হইতে উঠিয়া গিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হাতটি ৪।৫ বার সঞ্চালন করিয়া অল্প পরে ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া বলিলেন,--"দেখ, আর মেঘও ডাকিবেনা, বিদ্যুৎ ও চমকাইবে না।" বস্তুতঃ ইহা বলিবার ৪।৫ মিনিট পরেই আকাশে সে তাণ্ডব নৃত্য একেবারে থামিয়া গেল—বৃষ্টি যেমন পড়িতেছিল, তেমনই পড়িতে লাগিল। দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া গুরুদেব দেখাইলেন, হাতের কব্জি হইতে কনুই পর্য্যন্ত প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা হরিদ্রাবর্ণের এক রেখা পড়িয়া গিয়াছে।

কেবলমাত্র হস্ত সঞ্চালন দ্বারা এরূপ মেঘগর্জ্জন কি করিয়া বারিত হয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ—জানি না আমি তাঁহার ব্যাখ্যা ভুল বুঝিয়াছি কি না।

বহির্জগতে যাবতীয় পরমাণু আছে সমস্তই সূক্ষ্মভাবে আমাদের দেহে আছে। বিশেষ কতকগুলি পরমাণুর সমা-

বেশের ফলেই আকাশে মেঘ গর্জ্জন হইতেছিল—তাহার প্রতিরোধক পরমাণু সেই স্থানে কোনও রূপে উত্তেজিত করিতে পারিলেই মেঘ গর্জ্জনের নিবৃত্তি হইবে। সে গুলিকে উত্তেজিত করিয়া মেঘ গর্জ্জনের স্থানে পাঠাইতে পারিলেই গর্জ্জনের নিবৃত্তি হইবে। হাতের পীত দাগটি সেই প্রতিরোধক পরমাণুর উত্তেজনার চিহ্ন। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই ঐরূপ করিতে পারে না কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"পাচক ব্রাহ্মণকে একটু আগুন দিতে বল, সে হাতে করিয়াই একটি জ্বলন্ত কয়লা দিবে; তুমি কিন্তু ঐরূপ একটি কয়লায় হাত দিলেই পুড়িয়া যাইবে। তাহার শরীরের একরূপ বিভিন্ন উপাদান হইয়া গিয়াছে। আমি যাহা করিলাম তুমি তাহা করিতে চেষ্টা করিলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে"।

১৩৩৫ সালে ৺কাশীধামে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব হইয়াছিল। সেই দিন অন্যান্য গীত বাদ্যাদির আয়োজনের মধ্যে ——বাবু নামে এক ভদ্রলোকের পুত্রেরা কীর্ত্তনাদি গাহিয়াছিল। ঐ গান শুনিতে শুনিতে——বাবুর ভাব-সমাধি হয় —অর্থাৎ তিনি যে ভাবে বসিয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। গোপীনাথ বাবু শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"বাবা,——বাবুর ভাবসমাধি হইয়াছে।" শ্রীশ্রীগুরুদেব কিন্তু গোপীনাথ বাবুর কথা বিশেষ গ্রাহ্য করিলেন বলিয়া মনে হইল না—বরং depreciating ভাবেই সামান্য কিছু উত্তর করিলেন।

সন্ধ্যা হইলে আহ্নিকের জন্য গুরুদেব উপরে চলিয়া যাইলেন——বাবু যেমন ভাবে বসিয়াছিলেন তেমনই ভাবে বসিয়া রহিলেন। সেই ভাবে তখন প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। আমি পূর্ব্বে কখনও ঐরূপ অবস্থা কাহারও দেখি নাই। কাজেই ঐরূপ ভাব কি করিয়া হয় এবং ঐ ভাবের মূল্যই বা কি এইরূপ বিচার মনে মনে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ ভাবে করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। এমন সময়ে শ্রীশ্রীগুরুদেব যেন ৩।৪টি কথায় সমস্ত ব্যাপারটি মনের ভিতরে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ—তাঁহার ঠিক কথাগুলি আমার এখন মনে নাই এবং সেগুলি অতি সংক্ষিপ্ত। Peculiar physiological complex এর সৃষ্টির ফলে——বাবুর যে অবস্থা হইয়াছিল সেইরূপ অবস্থা এক প্রকার রোগ বিশেষ। প্রথম প্রথম যখন তিনি কীর্ত্তনাদি শুনিতেন তখন তিনি চেষ্টা করিয়া মনে একরূপ ক্রন্দনের ভাব আনিতেন। সেই ভাবটি, যাহাকে প্রথমে হয়ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া আনিতে হইত, তাহা বাড়িতে বাড়িতে প্রবল হইয়া উঠিল এবং শেষে যখন আয়ত্ত রাখার বহির্ভূত হইয়া পড়িল তখন তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন —যাহাকে সকলে ভাব-সমাধি আখ্যা দিতেছেন।

কীর্ত্তনের মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা, বিশেষতঃ বহুর এককে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা, অতি প্রবল। উন্মাদিনী বৃত্তির গুণ এই যে মানুষকে কেবল সেই বিষয়েই দুর্ব্বল করে না—তাহার

সমস্ত মনোবৃত্তি গুলিকেই দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। মনের সমতা (balance) রাখিবার জন্য মন সদাই সচেষ্ট। উন্মাদিনী বৃত্তির পরিপুষ্টির সহিত মনের যে স্বাভাবিক ক্লান্তিরোধক বৃত্তি আছে তাহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে—ফলে উত্তেজনা দমন করিবার ক্ষমতা কমিয়া আসিয়া ভাব, মূর্চ্ছা ইত্যাদির কারণ হইয়া উঠে।

——বাবুর অবস্থা উচ্চ কি নীচ, বা তিনি কতখানি ধার্ম্মিক, তাহা আলোচনা করিয়া লিখিতেছি না—যে অবস্থাকে সচরাচর আমরা ভাব-সমাধি বলিয়া থাকি, তাহার মূল্য কি সেই প্রশ্নের উদয় আমার মনে হইয়াছিল এবং গুরুদেব কৃপা করিয়া সেই সমস্যা ঐ ভাবে পূরণ করিয়াছিলেন। ব্যক্তি-বিশেষের কোনও রূপ আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে।

চৈত্র মাসে ৺কাশীতে আশ্রমে একদিন বেলা প্রায় ২টা আন্দাজ নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটিয়াছিল—

আমি ঐ দিন ঐ সময়ে Stock Exchangeএ বিশেষ কিছু কাজ না থাকায় একটি বেঞ্চে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ দেখি শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার নিকট হইতে প্রায় ১৫ হাত দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। গায়ে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী গলায়, অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের চাদর জড়ানো। তিনি কিন্তু আমার দিকে চাহিলেন না। ঐ গোলমালে ঐ সময় তাঁহার আবির্ভাবে আমি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ভাবিলাম যে বাজারের দর কিরূপ থাকিবে তাহা জানিয়া লই। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও মনকে কথা কহিবার

যোগ্য করিতে পারিলাম না। গলায় চাদর দেখিয়া আমি মনে করিলাম, এমন সময় বোধ হয় গুরুদেব কোনও শিষ্যের বাটী হইতে ফিরিতেছেন। মোহিনী বাবু ৺কাশী হইতে ফিরিবার পরে তাঁহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"না, গুরুদেব সেইদিন কোথাও যান নাই—ভূষণ বাবু আশ্রমেই ভোগ দিয়াছিলেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তাঁহার গলায় ব্যথা বা সর্দ্দির ভাব হইয়াছিল?" তাহাতে বলিলেন,—"না, গুরুদেব ভালই আছেন।" মনে কেমন খটকা লাগিল। যে দিন বর্দ্ধমান হইতে গুরুদেবকে কলিকাতা লইয়া আসি (Easter Monday) সে দিন তিনি Stock Exchangeএ গিয়াছিলেন কি না জিজ্ঞাসা করায় স্বীকার করিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম শুনিয়া যেন আনন্দিত হইলেন। আমি তখন গলার চাদরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি কিছু উত্তর না দিয়া তাঁহার গায়ে যে চাদর ছিল সেই খানি গলায় জড়াইলেন। দেখিয়াই চমৎকৃত হইলাম—ঠিক সেই ভাব, সেই রঙ্গ, এক কথায় যেন ঠিক সেই মূর্ত্তি রেলের গাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছেন।

আমার পূর্ব্ব হইতেই ধারণা ছিল যে সঞ্চার-অনুভূতি অপেক্ষা সেই মূর্ত্তির সহিত কথোপকথন আরও কঠিন—তাহা ঐ দিনের ঘটনায় বিশেষরূপ বুঝিলাম। আমি sordid motiveএ earthly ব্যাপার লইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করায় সক্ষম হই নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস

সমস্ত মনোবৃত্তি গুলিকেই দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। মনের সমতা (balance) রাখিবার জন্য মন সদাই সচেষ্ট। উন্মাদিনী বৃত্তির পরিপুষ্টির সহিত মনের যে স্বাভাবিক ক্লান্তিরোধক বৃত্তি আছে তাহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে—ফলে উত্তেজনা দমন করিবার ক্ষমতা কমিয়া আসিয়া ভাব, মূর্চ্ছা ইত্যাদির কারণ হইয়া উঠে।

——বাবুর অবস্থা উচ্চ কি নীচ, বা তিনি কতখানি ধার্ম্মিক, তাহা আলোচনা করিয়া লিখিতেছি না—যে অবস্থাকে সচরাচর আমরা ভাব-সমাধি বলিয়া থাকি, তাহার মূল্য কি সেই প্রশ্নের উদয় আমার মনে হইয়াছিল এবং গুরুদেব কৃপা করিয়া সেই সমস্যা ঐ ভাবে পূরণ করিয়াছিলেন। ব্যক্তি-বিশেষের কোনও রূপ আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে।

চৈত্র মাসে ৺কাশীতে আশ্রমে একদিন বেলা প্রায় ২টা আন্দাজ নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটিয়াছিল—

আমি ঐ দিন ঐ সময়ে Stock Exchangeএ বিশেষ কিছু কাজ না থাকায় একটি বেঞ্চে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ দেখি শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার নিকট হইতে প্রায় ১৫ হাত দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। গায়ে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী গলায়, অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের চাদর জড়ানো। তিনি কিন্তু আমার দিকে চাহিলেন না। ঐ গোলমালে ঐ সময় তাঁহার আবির্ভাবে আমি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ভাবিলাম যে বাজারের দর কিরূপ থাকিবে তাহা জানিয়া লই। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও মনকে কথা কহিবার

যোগ্য করিতে পারিলাম না। গলায় চাদর দেখিয়া আমি মনে করিলাম, এমন সময় বোধ হয় গুরুদেব কোনও শিষ্যের বাটী হইতে ফিরিতেছেন। মোহিনী বাবু ৺কাশী হইতে ফিরিবার পরে তাঁহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"না, গুরুদেব সেইদিন কোথাও যান নাই—ভূষণ বাবু আশ্রমেই ভোগ দিয়াছিলেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তাঁহার গলায় ব্যথা বা সর্দ্দির ভাব হইয়াছিল ?" তাহাতে বলিলেন,—"না, গুরুদেব ভালই আছেন।" মনে কেমন খটকা লাগিল। যে দিন বর্দ্ধমান হইতে গুরুদেবকে কলিকাতা লইয়া আসি (Easter Monday) সে দিন তিনি Stock Exchange এ গিয়াছিলেন কি না জিজ্ঞাসা করায় স্বীকার করিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম শুনিয়া যেন আনন্দিত হইলেন। আমি তখন গলার চাদরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি কিছু উত্তর না দিয়া তাঁহার গায়ে যে চাদর ছিল সেই খানি গলায় জড়াইলেন। দেখিয়াই চমৎকৃত হইলাম—ঠিক সেই ভাব, সেই রঙ্গ, এক কথায় যেন ঠিক সেই মূর্ত্তি রেলের গাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছেন।

আমার পূর্ব্ব হইতেই ধারণা ছিল যে সঞ্চার-অনুভূতি অপেক্ষা সেই মূর্ত্তির সহিত কথোপকথন আরও কঠিন—তাহা ঐ দিনের ঘটনায় বিশেষরূপ বুঝিলাম। আমি sordid motive এ earthly ব্যাপার লইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করায় সক্ষম হই নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস

এই বৎসর রথের সময় ৺পুরীধামে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি সমুদ্রের ধার হইতে বেড়াইয়া একলা ফিরিতেছিলাম। আশ্রম হইতে প্রায় ৩০০ হাত দূরে আছি, এমন সময় দেখিলাম আশ্রমের ছাদের উপর শুভ্রকায় নগ্নদেহ এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন—ঠিক যেন সাক্ষাৎ শঙ্কর। দেখিতে ২ আমি আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ মিনিট কাল পরে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। আমার বেশ মনে আছে সে দিন আমি প্রায় একঘণ্টাকাল বেড়াইয়াছিলাম এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ইষ্ট মন্ত্র জপের ফলে মন এক শান্ত আনন্দভাবে আপ্লুত ছিল। ঐরূপ মূর্ত্তি—ঠিক ঐ মূর্ত্তি নয়—আমি পূর্ব্বে দুইবার বর্দ্ধমান আশ্রমের ছাদে দেখিয়াছিলাম বলিয়া গুরুদেবকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—"হাঁ, আমি যেখানে থাকিব সেখানে কিছু একটা অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে।" প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ৺পুরীর আশ্রমেই একদিন রাত্রি প্রায় একটা আন্দাজ আমি নীচের বারেণ্ডায় নামিয়া আসি। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি সমস্ত প্রায়ান্ধকার। আমি অন্যমনস্কভাবে নামিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় দেখি বারাণ্ডার কোণে অপূর্ব্ব শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এক অতি সুন্দর মূর্ত্তি যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি ভয়ে একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। প্রায় মিনিট খানেকের পর মোহ ভাব কাটিয়া যাইলে আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। স্বাভাবিক আমার ভয় কম, কিন্তু জীবনে আমি কখনও ঐরূপ ভয়-স্তম্ভিত

হই নাই। গুরুদেবকে ঘটনা বলিয়া ঐরূপ ভয় পাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন,—"প্রবল তাড়িতের নিকট দুর্ব্বল তাড়িতের যে অভিভূত অবস্থা হয় তাহারই নাম ভয়। তুমি অতি প্রবল শক্তি বিশিষ্ট কোনও মহাপুরুষের সম্মুখীন হওয়ায় তোমার ঐরূপ ভাব হইয়াছিল।"

এই বৎসর গ্রীষ্মকালে গুরুদেব যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন একদিন সন্ধ্যায় আহ্নিক করিতেছি এমন সময় স্পষ্ট অনুভব করিলাম যে ঘরে গুরুদেব আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি একলা নহেন, সঙ্গে অপর আর একজন সেইরূপই অশরীরি-ভাবে রহিয়াছেন। অত্যল্পকাল পরে আহ্নিক শেষ করিয়াই আশ্রমে (২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনে) যাইয়া দেখি, ভৃত্য পরমেশ্বর পদসেবা করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজ ঘরে কি আপনি একলা গিয়াছিলেন ?" গুরুদেব বলিলেন,—"না, আর একজন ছিলেন।" "তিনি কে" বারংবার জিজ্ঞাসা করাতেও উত্তর দিলেন না, কেবল বলিলেন,—"কোনও এক বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন—তাঁহার নামে তোমার প্রয়োজন নাই।" আমার ধারণা ছিল যে যখন তিনি ঐরূপ অশরীরি-ভাবে ভ্রমণ করেন তখন তাঁহাকে কাহারও স্পর্শ করা উচিত নয় এবং তিনিও ঐরূপ স্পৃষ্ট অবস্থায় ঐ ভাবে সঞ্চারিত হন না। এ ক্ষেত্রে ভৃত্য তাঁহার পদসেবা করিতেছিল, তথাপি তিনি অন্যত্র বিচরণ করিতেছিলেন। এই ভাবের কথা তাঁহাকে বলায় উত্তর দিলেন,—"তাহাতে কি ?

আমার এই স্থূল শরীরই না হয় তাহার হাতের ভিতরে আছে —আমার মন কিংবা সূক্ষ্ম দেহ ত আর সে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই।

গত ৺জন্মাষ্টমীতে আমি বর্দ্ধমান আশ্রমে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বদিন রাত্রে আমি, আমার বাবা, রায় সাহেব ননীলাল মুখোপাধ্যায় এবং আরও ২।১ জন, আমরা আশ্রমের এক তলার হলে গুরুদেবের আসনের দিকে মাথা করিয়া ঘুমাইতেছিলাম। মধ্য রাত্রে কাহার যেন অস্ফুট কথাবার্ত্তায় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া দেখি গুরুদেব উপস্থিত এবং তাঁহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণ বর্ণের একটি ছোট বালক। আমাদের মাথার গোড়া দিয়া যাইতে ২ গুরুদেব যেন আমাদের সম্বন্ধে কিছু ২ বালককে বলিতেছেন বলিয়া মনে হইল। আমি তাঁহার ক্ষুদ্রকায় ও বর্ণ দেখিয়া ভাবিলাম ইনিই বুঝি শ্রীশ্রীগোপাল। পরদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন মহাযোগী শ্রীমৎ উমানন্দ স্বামী ঐ রূপ ধরিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ঐরূপ দেহ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বিশেষ কিছুই বলিলেন না, কেবলমাত্র বলিলেন,—"খেয়াল।"

সদ্‌গুরুর কৃপায় কি করিয়া শিষ্যের কুগ্রহের প্রভাব হ্রাস হইয়া যায় তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে দিতেছি। দুর্ভোগ কম হইলেও শিক্ষার জন্য কিছু পরিমাণে শাস্তি পাওয়া প্রয়োজন।

প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার পাটের বাজারে ফট্‌কা খেলি। এই খেলার নিয়ম অনুসারে যাহার সহিত খেলা

হইবে তাহার নিকট কিছু টাকা অগ্রিম জমা রাখিতে হয়। আমি ১০০০৲ টাকা জমা রাখি। প্রথম কিছু২ লাভ হইয়াছিল। আমিও বেশ প্রফুল্ল ছিলাম। পরে হঠাৎ jute forecast-এ সেই বৎসর আমার হিসাব অপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ গাঁঠ পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া লিখিল। প্রায় ৮৲ টাকা করিয়া দর নামিয়া গেল। ফলে আমার প্রায় ৪০০০৲ টাকা লোকসানের সম্ভাবনা হইল। শ্রীশ্রীগুরুদেব তখন কলিকাতায় ২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাটীতে থাকেন। সন্ধ্যার সময় ঐরূপ ক্ষুণ্ণ কেন জিজ্ঞাসা করায় আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে কাতরভাবে অনুরোধ করিলাম। তিনিও স্পষ্টরূপে ভরসা দিলেন। তাহার পরদিন বেলা ৪টার সময় যে দর থাকিবে সেই হিসাবে আমাকে লোকসান দিতে হইবে। বেলা প্রায় ২টার সময় হঠাৎ খবর আসিল দর ৮।০ বাড়িয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ হিসাব পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম এবং দালালী ইত্যাদি বাদে আমার মোট ৬।০ লাভ রহিল। হঠাৎ এরূপ দর বাড়িয়াছে কেন, কারণ জিজ্ঞাসা করায় লোকেরা বলিল যে,--"যে সকল পাট গাঁঠ বাঁধিয়া চালান যায় সেই পাট এই বৎসর কম হইয়াছে--অন্যান্য রকমের পাট বেশী হইয়াছে।" কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তির উপর অবস্থিত ছিল, কারণ আবার ৩টা বা ৩।টা আন্দাজ দর ৭৲ টাকা নামিয়া যাইল। আমি কিন্তু যাহার সহিত খেলিতেছিলাম সে হঠাৎ ফেল হইয়া যাইল। আমার জমা ১০০০৲ টাকা আদায় করিতে প্রায় ৩ বৎসর

লাগিয়াছিল। গুরুদেবের কৃপায় লোকসান কিছু হইল না বটে কিন্তু শিক্ষার জন্য নিজের প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে এত বিলম্ব হইল। গুরুদেবের কৃপায় যদি বিনা কারণে কেবলমাত্র আমার সওদার জন্য হঠাৎ ৮৲ টাকা দর বাড়িতে পারে তবে ১০০০৲ টাকা পাইবার সম্বন্ধেও কিছুকাল না হইতে পারিত।

নিজের জীবনে এরূপ ঘটনা আরও ৩।৪ বার বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে এরূপ দৃষ্টান্তের মূলে বিশ্বাসের কথা রহিয়াছে বলিয়া তাহা লেখা উচিত মনে করি না।

নিম্নে দুইটি ঘটনার বিষয় লিখিতেছি যাহা পড়িয়া প্রথমে ইচ্ছাশক্তির কার্য্য বলিয়া ভুল হইলেও উহা বস্তুতঃ সম্পূর্ণ ভূতেশ্বরত্বের ফলে সাধিত হয়।

একদিন বৈকালে আমি ও কুঞ্জবাবু আশ্রমে বসিয়াছিলাম। খেলার ছলে একটি আধলা পয়সা লইয়া তাহা ঘুরাইতে ২ গিনি করিলেন এবং শেষে "আর একটু মজা দেখ" এই বলিয়া গিনিটি ছুঁড়িয়া দিলেন। ছুঁড়িবামাত্রই electric sparkএর ন্যায় শব্দ হইল এবং প্রায় ২।৩ হাত অবধি একটি স্বর্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া গেল। আর গিনিটিও অদৃশ্য হইয়া গেল। ইচ্ছাশক্তির কার্য্য তৎক্ষণাৎ সাধিত হইবে—ইচ্ছা এবং কার্য্যের মধ্যে কোনও ব্যবধান থাকিবে না এবং তাহাতে কোনওরূপ অঙ্গ চালনার প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে আধলা গিনি হইতে প্রায় অর্দ্ধমিনিটকাল সময় লাগিয়াছিল এবং অদৃশ্য করিবার জন্যও গিনিটিকে ছুঁড়িয়া দিতে হইয়াছিল।

শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বোধ হয় গুরুদেবকে অঙ্গুলি দ্বারা টাকা আকৃষ্ট করিয়া শূন্যে তুলিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু অনেকে হয়ত ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে উত্থিত টাকাটি মাটিতে ফেলিবার সময় তিনি সজোরে ফেলিয়া দেন। ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"যে তড়িৎ দ্বারা আমি টাকাটি তুলিলাম ঐ তড়িৎ পুনরায় বায়ু মণ্ডলে মিলাইয়া দিবার জন্য ঐরূপ করা প্রয়োজন।" গিনির বিষয়েও ঐ যুক্তি প্রযোজ্য। যে পরমাণু সমষ্টি আকর্ষণ করিয়া আধলাকে গিনিতে পরিণত করা হইল সেই পরমাণু সমষ্টিকে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিবার জন্য গিনিটি সজোরে শূন্যে নিক্ষেপ করা আবশ্যক।

তিন দিন পূর্ব্বে সকালে Eden Gardenএ বেড়াইতে বেড়াইতে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাস্তা হইতে প্রায় ২০ ফিট তফাতে কেনা গাছে কেনা ফুল ফুটিয়াছিল। যেই গুরুদেব হাত নাড়িলেন অমনি একটি sparkএর ন্যায় শব্দ হইল ও একটি কেনা ফুল ছিঁড়িয়া আসিয়া তাঁহার হাতের মধ্যে পড়িল। যে শক্তিতে ফুল বৃন্তে লাগিয়া থাকে সেই শক্তি টানিয়া লওয়ার ফলেই ঐরূপ ঘটিয়াছিল। গাছের অন্যান্য ফুল বৃন্তচ্যুত হইল না কেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে,—"আমি কেবলমাত্র একটি বিশেষ ফুলের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চার করিয়াছিলাম বলিয়া ঐটিই আসিল।"

এই প্রসঙ্গে পুনরায় পানে পদ্মগন্ধ হওয়ার ব্যাপার উল্লেখ করিতে হইতেছে। সূর্য্যবিজ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিতে প্রভেদের

কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়াছিলেন—"ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কেবলমাত্র ইচ্ছার ফলে ব্যাপক ভাবে সাধিত হয়।" একটি পান দিতে২ বলিলেন,—"ইচ্ছা করি ইহাতে পদ্মগন্ধ হউক।" ফলে সেটিতে ত পদ্মগন্ধ হইলই এবং ডিবার সকল পানেই ঐরূপ গন্ধ হইল।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ

জমীদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরী।

আমার জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া কাহারও হৃদয় কলুষিত করিতে চাহি না। কেবল এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমি এমন অনেক কার্য্য করিয়াছি, যাহা আমি জনসমাজে ব্যক্ত করিতে অক্ষম। এইরূপ ভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল, না ছিল আমার ধর্ম্মে বিশ্বাস, না ছিল আমার ভগবানে আস্থা। একদা আমার স্বর্গীয় পিতার জীবদ্দশায় ৺শশিশেখর রায় নামক জনৈক ভদ্রব্যক্তি পুরীতে Superintendent of Salt and Excise হইয়া আগমন করেন। ইঁহার একজন আলোকসামান্য "গুরু" পূর্ব্ব হইতেই এই পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা আমরা জানিতাম না। পরে এই মহাপুরুষটির সহিত আমরা পরিচিত হই এবং তিনি দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে প্রায় প্রত্যহই আসিতেন। ইনি শ্রীরঙ্গাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন এবং আমরা তাঁহাকে (দীক্ষা না লইলেও) "গুরুজি" বলিয়া ডাকিতাম। ইঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তারপর আমার পিতার মৃত্যু হয় এবং ইহার কিয়ৎদিবস পর ৺শশীবাবু দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইয়া যান। একদিন গুরুজী হঠাৎ আমার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"আমি

জন্য আগমন করেন। তিনি শাস্ত্র দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদী—আমি কিন্তু বৈষ্ণব প্রবর্ত্তিত ভেদাভেদবাদে বিশ্বাসী। আমাদের দুইজনের শাস্ত্র লইয়া অনেক সময় তর্ক বিতর্ক হইত। একদিন এইরূপ তর্ক হইতেছে, এমন সময়ে যামিনী দাদার কর্ম্মচারী আসিয়া খবর দেন যে, ৺পুরীতে "শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব" নামক একজন সিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন। যামিনীদাদা শুনিয়া বলিলেন,—"আমি তাঁহাকে জানি, এরূপ মহাপুরুষের পদস্পর্শেও পুণ্য হয়।" আমি কিন্তু গোঁড়ামীবশতঃ বলিলাম,—"আমি যোগীর নিকট যাই না।" তিনি আমাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। পরে আমি সাব্যস্ত করিলাম, আচ্ছা, সাক্ষাতে দেখিই না কিরূপ। তৎপর দিবস আমরা উভয়ে সেই মহাপুরুষের নিকটে আসিলাম, ইনিই যে আমার "গুরুদেব" হইবেন তখনও জানিতে পারি নাই।

যাহা হউক, সেখানে অনেক তত্ত্ব কথাই হইল এবং গুরুদেবের সহজ সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। শাস্ত্র-কথা চলিতেছে, এমন সময় আমি মূত্র ত্যাগ করিতে বাহিরে আসিলে, যামিনী দাদা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার ভায়রাভাইটিকে কেমন দেখিলেন?" গুরুদেব নাকি যামিনী দাদাকে বলিয়াছিলেন,—"বেশ ছেলে।" আমি বাহির হইতে আসিয়াই পুনরায় তত্ত্বকথায় যোগ দিলাম ও সন্ধ্যা লাগিবার কিছু পূর্ব্বে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি আপনার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

তাহাতে গুরুদেব আমাকে বলিলেন যে,—"বেলা ১০টার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যখন ইচ্ছা দেখা করিতে পার।" তারপর আমি ও যামিনী দাদা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে যামিনী দাদা আমাকে বলিলেন,—"ওহে, আমি তোমার বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে তুমি বেশ ছেলে।" এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ইনি ত বেশ যোগী। আমার মত দুশ্চরিত্র ছেলেকে যিনি "বেশ ছেলে" বলিয়া বর্ণনা করেন তিনি কোন মতেই যোগী হইতে পারেন না। এরূপ লোকের নিকট যাব কি যাব না, এরূপ চিন্তায় রাত্রি দুই প্রহর হইল। এক-বার মনে হইতেছে যাবার কোন প্রয়োজনই দেখি না, তারপর ভাবিতেছি গিয়া ব্যাপারটা দেখি না কেন? যাহা হউক, শেষে যাওয়াই স্থির করিলাম ও পরদিন ঠিক বেলা ১০টার পর গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। 'গুরু-দেব,' আমাকে দেখিয়াই আমাকে একটি নিভৃত কক্ষে লইয়া গেলেন ও আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, যখন বাহিরে গিয়াছিলে, সেই সময় যামিনী তোমার কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে তুমি —"তুমি বেশ ছেলে। আচ্ছা, বল দেখি, আমি কেন যামিনীর কাছে তোমার কুৎসা কহিব!" আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। ইনি প্রথম হইতেই এই কথা উত্থাপন করিবার অর্থ আর কিছুই নহে। আমি যে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি এই

কথা লইয়া অনেক আন্দোলন করিয়াছি তাহাতেই ইহা উঠাই-লেন। তিনি শুধু এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। পরন্তু আমার জীবনের দুই একটি কাহিনী কহিলেন, যাহা কেবল আমিই জানি, আর কেহ জানে না। আমি যখন স্থির বুঝিলাম যে, তিনি আমার সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বলুন দেখি, আমার মত ছেলে, ভগবান পাওয়া তো দূরের কথা, ভগবানের দিকে যেতে পারে কিনা ?" তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বাবা, ভগবানের সত্তা যদি তোমাতে না থাকিত তাহা হইলে তোমার ফিরিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন শুধু ভগবানের দিকে যাওয়া কেন, চরিত্র বজায় রাখিয়া যথাবিধি যোগাভ্যাস করিলে ভগবদ্দর্শন হইবেই হইবে।" এইরূপ জোরের কথা আর কোথাও শুনি নাই। অবশ্য ইহাতে প্রাণ শীতল হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তবে ফলে এই হইল যে যোগীর নিকট আসা বন্ধ না করিয়া প্রত্যহ বেলা সাড়ে দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটই থাকিতে লাগিলাম। এইরূপ ৩।৪ মাস ধরিয়া নিয়ত সঙ্গ করায় আমি তাঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করি ও অবশেষে তাঁহার শ্রীচরণে দীক্ষার প্রার্থী হই। অনেক দিনের পর তিনি মহাষ্টমীর দিন আমার দীক্ষার জন্য স্থির করিলেন। আমি এই পুণ্য দিবস দীক্ষা লইতে তাঁহার নিকট আসিলাম। এ দীক্ষার বিশেষত্ব এই ছিল যে ইনি দীক্ষার্থীর সম্মুখে তাঁহার

ইষ্টদেবতাকে তাঁহার মস্তক হইতে বাহির করিয়া দীক্ষার্থীর দ্বারা পূজা করাইলেন। গুরুদেব যখন তাঁহার মস্তক হইতে আমার ইষ্টদেবতাকে বাহির করিলেন তখন আমি স্তম্ভিত হইলাম। এখানে আর এক কথা বলিয়া রাখি ; আমি কুল-প্রথামতে কুলগুরুর নিকট হইতে পূর্ব্বেই মন্ত্র লইয়াছিলাম। এই মন্ত্রানুগত দেবতাকেই আমার বড় ভাল লাগিত। আমি গুরুদেবের নিকট দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে মনে মনে ভাবিতাম যে আমার এই দেবতানুযায়ী যদি মন্ত্র না হয়, তাহা হইলে আমার বড় কষ্ট হইবে। পরিশেষে দীক্ষার দিন গুরুদেব আমাকে বলিলেন,—"তুমি কুলগুরুর নিকট এই মন্ত্রই লইয়াছ এবং আমি বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে এই মন্ত্রানুগত দেবতাই তোমার ইষ্টদেবতা।" তবে তিনি ঐ মন্ত্রের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে উহাই আমার ঠিক মন্ত্র ও ঐ মন্ত্র জপ করিলে আমার ইষ্টলাভ হইবে। তারপর আমাকে যোগ প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইহাই হইল আমার দীক্ষার ইতিহাস।

আমাদের দুইজনের অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। গুরুদেব তখন পুরীতে, এমন সময়ে আমার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিবার জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইল। যখন কলিকাতা যাই তখন আশ্রমে গুরুদেবকে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলাম। আমি প্রণাম করিয়া উঠিলেই গুরুদেব আমার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এ মেয়ের বিবাহের ভাবনা ভাবতে হবে না।" কলিকাতায় গিয়া

আমার ভগিনীর জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য বিষয় যে ভগিনীর জন্য কোন পাত্র জোটে না বটে, অথচ যিনি আমার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে দেখেন, তিনিই তাহার জন্য একটী পাত্রের খবর লইয়া আমায় জেদাজেদী করেন। এইরূপে এত ভাল পাত্র জুটিল যে কাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব, স্থির করা দুরূহ হইল। অবশেষে একটী সুপাত্রের পিতাকে জবাব দিলাম। ইহার কিছুদিন পর আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া আমার স্ত্রী ও ছেলেদের তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়াই আমার কন্যার Influenza হয়। যখন আমার কন্যার অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়া উঠিল তখন গুরুদেব পুরী থাকিলেও সূক্ষ্ম শরীরে কলিকাতায় আমার শ্বশুর বাড়ীতে আসিতেন। আমার স্ত্রী চাক্ষুষ দেখিতে পাইত, কিন্তু আমি পাইতাম না। তবে তিনি সূক্ষ্ম শরীরে আসিলে সমস্ত ঘর গন্ধে ভরিয়া যাইত। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে যখন কোন সূত্রে গন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই তখন তিনি সূক্ষ্ম শরীরে আসিলেই সমস্ত ঘরটী গন্ধে ভরিয়া যাইবে। যিনি সূক্ষ্ম শরীর চাক্ষুষ দেখিতে পান না, তাঁহার প্রতি ইহাই হইল সঙ্কেত। যাহা হউক, আমার কন্যার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। অবশেষে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে কন্যার বিবাহের ভাবনা কি জন্য মোটেই ভাবিতে হইত না।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ।